মাওলানা মওদূদী (রহ.) এর উপর আরোপিত

অভিযোগের তাত্ত্বিক আলোচনা

সত্যের আলো

মাওলানা বশিরুজ্জামান

সত্যের আলো

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর উপর আরোপিত
অভিযোগের তাত্ত্বিক আলোচনা

যারা বিনা অপরাধে
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে
মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কষ্ট দেয়
তারা প্রকাশ্য পাপের বোঝা
বহন করে।

২৪ঃ৫৮

সত্যের আলো

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর উপর আরোপিত অভিযোগের তাত্ত্বিক আলোচনা

মাওলানা বশীরুজ্জামান

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল:
প্রথম সংস্করণ: মার্চ' ১৯৮৮ ইংরেজী
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর' ১৯৮৯ ইংরেজী
তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী' ১৯৯৮ ইংরেজী
দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারী' ২০১১ ইংরেজী

সত্যের আলো ◆ মাওলানা মওদূদী (রহ:)-এর উপর আরোপিত অভিযোগের তাত্ত্বিক আলোচনা, **মাওলানা বশীরুজ্জামান** ◆ **প্রকাশক:** এ এম আমিনুল ইসলাম ◆ প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬ ◆ **কম্পোজ ও ডিজাইন:** মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রফেসর'স কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা ◆ **গ্রন্থস্বত্ব:** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ◆ **মুদ্রণ:** ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা।

PPBN- 018
ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র ।

বইটি যেখানে পাওয়া যাবে

ঢাকা : মগবাজার, পল্টন, বায়তুল মোকাররম, কাঁটাবন, নীলক্ষেত ও বাংলা বাজার লাইব্রেরী সমুহে।

সিলেটে : কুদরতুল্লাহ মার্কেট লাইব্রেরী সমুহে।

চট্টগ্রাম : আন্দর কিল্লাহ- আযাদ বুকস, আল আমিন, রহমানিয়া ও বি আই এ লাইব্রেরী সমূহে,

ফেনী : ইসলামী বই ঘর, মিল্লাত লাইব্রেী, মিজান রোড়।

নোয়াখালী : আলহেরা বুক সেন্টার, চৌমুহনী, স্টুডেন্ট, প্রফেসর লাইব্রেরী।

খুলনা : সাহল বুক,

যশোহর : আল হেলাল লাইব্রেরী ও হেলাল বুক ডিপো।

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বাভাষ

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম সিপাহসালার, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক, বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা ও অনন্য সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি তিনি হলেন মাওলানা মওদূদী সাইয়েদ আবুল আ'লা (রহঃ)।

বৃটিশ শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ যখন মসজিদ-মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে ইসলামকে নামায-রোযা ইত্যাদি কয়েকটি ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল, এমনকি বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে অমুসলিম ধ্যান-ধারণানুযায়ী ইসলামকে নিছক একটা ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, ঠিক এমনি মুহূর্তে ইসলামের সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ইসলামী কৃষ্টি-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর কোরআন-হাদীসের আলোকে অকাট্য যুক্তি দিয়ে বই লিখে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে প্রমাণ করেন যিনি, তিনি হলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)। যাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো পৃথিবীর চল্লিশ-এরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির সুর সুর মিলিয়ে এদেশের কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামও মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। তারা কিছু ইখতেলাফী মাসআলাকে কেন্দ্র করে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মাওলানাকে পথভ্রষ্ট, খারেজী, কাদিয়ানী, এমনকি কাফির ফতোয়া দিয়ে আসছেন। এক একটি মিথ্যা অপবাদ বিভিন্ন ব্যক্তি বর্ণনা করার কারণে মাওলানার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিরাও অনেক সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান। তাই আমি এই বইতে কয়েকটি খিতেলাফী মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা ও কয়েকটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদের বর্ণনা দিয়েছি, যাতে পাঠকবৃন্দ সহজেই সত্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই এই বইতে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। কারো কাছে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহপূর্বক জানালে কৃতজ্ঞতার সহিত শুধরিয়ে নেব।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমীন!

বিনীত—

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি যাকে চান সম্মান দান করেন এবং যাকে চান অসম্মানিত করেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। অতঃপর আমার লিখিত বই 'সত্যের আলো' প্রকাশের পর সারা দেশে বিশেষ করে সিলেটে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিকে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক প্রশংসাপত্র আসতে থাকে, অন্যদিকে সিলেটের এক চিহ্নিত স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বইটির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করে। তারা সম্মেলন-মহাসম্মেলন করে বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায়। কিন্তু 'আলহামদুল্লিাহ' সত্যের জয় হয়েছে, বইটি এখনও চালু আছে।

বইটি প্রকাশের দু'মাসের মধ্যেই সবগুলো কপি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন মহল থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার জোর দাবী আসতে থাকে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে বাধ্য হলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রণজনিত কিছু ভুলের সংশোধনীসহ অপ্রয়োজনীয় কিছু অংশ বাদ ও প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য যোগ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণে কয়েকটি প্রচলিত আরবী শব্দের বঙ্গানুবাদ যেমন সুবহে সাদিকের অনুবাদ 'প্রভাত' করায় অপপ্রচারকারীরা 'সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত বলে অপপ্রচার চালাবার প্রয়াস পেয়েছে। তাই দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সমস্ত শব্দের বঙ্গানুবাদের পরিবর্তে মূল শব্দই ব্যবহার করেছি।

প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণেও পাঠকদের খেদমতে আরজ করছি, যদি কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন। কৃতজ্ঞতা সহকারে তা সংশোধন করব।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমীন!

বিনীত—

গ্রন্থকার

ইলমে হাদিসের উজ্জ্বল নক্ষত্র, দারুল উলুম দেওবন্দের গর্ব, জ্ঞানসমুদ্র আল্লামা শফিকুল হক সাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, প্রাক্তন শায়খুল হাদিস, মাদ্রাসায়ে কাসিমুল উলুম, দরগায়ে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) সিলেট-এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الستار الغفار العلى العظيم وحده- ثم الصلواة والسلام على رسوله الكريم محمد الذى لانبى بعده- وعلى اله واصحابه الكرام الهداة الى الصراط المستقيم وعلى التابعين العظام الحماة للدين القويم -

اما بعد! میں جس وقت مبتلائے فالج مرض دائم، اور هاذماللذات موت میرے سریرقائم، نه ہاتھ میں زیادہ کچھ تحریر کر نے کی پوری طاقت، نه زبان میں روانگی کے ساتھ صحیح تلفظ سے تقریر کرنیکی کامل قوت ، پھر مرض کے ضعف وساتھ سالہ عمر کی پیری ، جسمانی ناتوانائی اوردماغی کمزوری- اسی اثناء میں عزیزم مولانا محمد بشیرالزمان" زاد علمه الحنان پیش امام حاجی قدرت الله جامع مسجد سلہٹ کی تالیف جدید "انوارصداقت" میرے پاس پہنچی - وقت کی قلت ، مشاغل کی کثرت کیوجه عدیم الفرصت ہو نیکی باعث سرسری نظرسے چند مقامات سے کچھ عبارات کومیں نے دیکھااس تالیف میں موصوف نے قوم کے اندر الجھائے ہوئے اعتراضی مسائل کو مستندمعتبر کتابوں سے ماخوذ جوابی دلائل کی روشنی میں سلجھانے کی کوشش کی- مصالح کومد نظررکھتے ہوئے مفاسدکوهٹا کر مقاصد اصلیه میں کامیابی کے راسته ہموارکرنیکی سعی بلیغ کی- یه بہترین کام اوربہت مبارك اقدام ہے دل شادهوکه دهن سے مؤ لف کو مبارك باد دیتارہا- جماعت اسلامی کے بانی مرحوم مولانا سید ابوالاعلی مودودی دارفنا سے

داربقاکو چلے گئے- انکی تمام تحاریر وتقاریر سے دینی خدمات جلیلہ، جملہ تالیفات وتصینفات سے ملی جذبات کثیرہ اظہر من الشمس وابین من الامس ہیں - والعیان لایحتاج الی البیان ۔

چونکہ کوئی انسان خطا ولغرش سے بالاترنہیں بنابریں موصوف کی تالیفات کی بعض بیانات میں اپنے خیالات کے طرزادا ، قیاس ارائی اور بےباکی سے لب کشائی وغیرہ میں کچھ لغزشیں ھوجانے کے بارے مین جو اعتراضات محترم معترضین حضرات نے کیں ان میں سے بعض حقیقت پر مبنی ھونے کی وجہ قابل احتراز، اور بعض بے اصل ھو نیکی وجہ "کالبناء علی الماء" اور بعض فروعی اختلاف کے نتائج ہیں -

میں دعاکرتا ھوں کہ خداوندکریم انکی زلات یسیرہ کو معاف کرکے حسنات کثیرہ کو شرف قبولیت سے نوازتے ھوئے آخرت کی درجات رفیعہ انکو نصیب فرمائے- آمین ثم آمین، فی الحال پاك بھارت ، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ایك منظم مضبوط مستقل جماعت ھونیکی وجہ سے پاك وبھارت دونون میں اکثر علمائےکرام اور سمجھدار عوام انکے ساتہ ملکردینی امور انجام دے رہے ہیں- بنابریں میرے خیال میں جب بنگلہ دیش میں اجرائے محاکم شرعیہ واقامت معالم دینیہ کیلئے جماعت اسلامی کے سوا منظم مضبوط مستقل کوئی جماعت نہیں ھے ، تب بنگلہ دیش کے علمائے کرام اور دیندارعوام کیلئ ضروری ھے کہ منظم مضبوط فرق باطلہ کے مقابلہ کے واسطے اس منظم مضبوط مستقل جماعت کی ہر ممکن امداد واعانت کریں ۔

واللہ اعلم بالصواب وعلیہ التکلان والیہ المتاب ۔

অভিমত-এর অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি মানুষের দোষত্রুটি গোপনকারী ও মহান। দরূদ ও সালাম তাঁর রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, যাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের উপর যাঁরা সরল সঠিক পথপ্রদর্শক।

অতঃপর, আমি যখন পক্ষাঘাত রোগে ভুগছি, মৃত্যু যখন আমার মাথার উপর দণ্ডায়মান, না আছে হাতে কিছু লিখার পূর্ণ শক্তি, আর না মুখে অনর্গল ও সঠিকভাবে কিছু উচ্চারণ করার পূর্ণ যোগ্যতা, তদুপরি ষাট বৎসর জীবনের বার্ধক্যতা এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা- এমনি একসময়ে প্রিয় মাওলানা মুহাম্মদ বশীরুজ্জামান পেশ ইমাম, হাজী কুদরতুল্লাহ জামে মসজিদ, সিলেট-এর নতুন বইয়ের সংকলন 'সত্যের আলো' আমার কাছে পৌঁছে। সময়ের স্বল্পতা ও অধিক ব্যস্ততার কারণে এর কিছু অংশ আমি দেখেছি। এতে লেখক জাতির মনে উত্থিত ইখ্‌তেলাফী মাসআলাসমূহকে প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে গৃহীত দলিলসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। উপযুক্ততার দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্যাসাদ দূর করে আসল উদ্দেশ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। এটা একটা শুভ কাজ ও মুবারক পদক্ষেপ। আমি আনন্দচিত্তে লেখককে মুবারকবাদ জানাই।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেছেন। তাঁর লিখনী ও বক্তৃতাসমূহের দ্বারা দ্বীনের যে বিরাট খেদমত এবং জাতির মধ্যে যে আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা দিবালোকের মত এমন পরিষ্কার, যার বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তাই তাঁর লিখনীর কোন কোন ব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারার বর্ণনাভঙ্গি, গবেষণা ও নির্ভিকভাবে কথা বলা ইত্যাদির মধ্যে কিছু ত্রুটি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগকারীরা যে সমস্ত অভিযোগ পেশ করেছেন, ওগুলোর কোনটি সত্য এবং এড়িয়ে চলার যোগ্য, কোন কোনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কোন কোনটি ফুরু'য়ী (শাখা- প্রশাখা জাতীয়) মাসআলার স্বাভাবিক ইখতেলাফের ফল। দো'আ করি আল্লাহ তা'লা তাঁর এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অগাধ পূর্ণতা দিয়ে পরিবর্তিত করে পরকালীন উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন। আমীন!

বর্তমানে পাক-ভারত-বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী সুশৃংখল, শক্তিশালী ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি দল হওয়ার কারণে পাক-ভারত-বাংলাদেশের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিমান জনসাধারণ তাঁদের সাথে মিলে দ্বীনের কাজ আনজাম দিচ্ছেন। সুতরাং আমি মনে করি, ইকামতে দ্বীনের জন্য যখন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত অন্য কোন শক্তিশালী দল নেই তখন বাংলাদেশের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের জনসাধারণের জন্য জরুরী যে, তারা যেন বাতিল দলসমূহের মোকাবেলার জন্য এই সুশৃংখল ও শক্তিশালী জামায়াতের কাজে সকল প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

মোহাম্মদ শফীকুল হক

২১ শে জানুয়ারী '৮৮ — প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, গাছবাড়ী জামেউল উলুম কামিল মাদ্রাসা

শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর সুযোগ্য ছাত্র
উপমহাদেশের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম, শায়খুল হাদিস আল্লামা ইদ্রীস আহমদ
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, সিলেট-এর

অভিমত

الحمد لاهله والصلوة والسلام على اهلها

মানুষ মাত্রই কিছু না কিছু ভুল হওয়া সর্বজনবিদিত। একমাত্র আম্বিয়া (আঃ) গন ছাড়া অন্য কেউই মাসুম (নিষ্পাপ) নহেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রতি শত বৎসর পরপর এক একজন মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হবে, তিনি সত্যিকারের ইসলামী বিপ্লবকে পুনর্জীবিত করবেন। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত তেরশত বৎসর হতে বিভিন্নস্থানে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন আকারে অনেক মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের বিপ্লবের ফলে ইসলামের মূলনীতিসমূহ তার মূল আকৃতিতে আজও বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম মুজাদ্দিদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর তাজদীদ ছিল রাজ্য শাসনের মাধ্যমে। এ জন্য তাঁর ঐ তাজদীদ ছিল সর্বাঙ্গীন তাজদীদ। দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ হযরত শাফেয়ী (রহঃ)-এর তাজদীদ ছিল লিখনীর মাধ্যমে। এ জন্য তাঁর এই তাজদীদ প্রথম মুজাদ্দিদের মত সর্বাঙ্গীন হয়নি।

বিংশ শতাব্দীতে বাতিল মতবাদসমূহের মোকাবেলাকারী মনীষীদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-এর নাম অগ্রগণ্য। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে বাতিল মতবাদসমূহের দাঁতভাংগা জবাব দিয়েছেন। বিশেষ করে কাদিয়ানীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করতে গিয়ে তিনি যে ফাঁসিকাষ্ঠের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি তাঁর লেখনীসমূহ যথাসম্ভব অধ্যয়ন করেছি।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর চিন্তাধারানুযায়ী বাতিল মতবাদসমূহের মোকাবিলা শুধুমাত্র লেখনীর দ্বারা যথেষ্ট নহে। তাই তিনি প্রথম মুজাদ্দিদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর পন্থানুসারে রাজ্য শাসনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম করার লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক জামায়াত (জামায়াতে ইসলামী) প্রতিষ্ঠা করেন। এ জামায়াতের মূলনীতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

মাওলানা মরহুমের বিরুদ্ধে কতিপয় নামধারী ও বিদ্বেষী আলিম যে সব মিথ্যা অথবা ভুল কটাক্ষ করেছেন, ওগুলো থেকে কিছু সংখ্যক অপবাদের সঠিক তথ্য তুলে ধরে প্রিয় মাওলানা বশীরুজ্জামান সাহেব 'সত্যের আলো' নামক যে কিতাব লিখেছেন আমি তা আগাগোড়া পড়ে দেখে শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ও নির্ভুল পেয়েছি।

আল্লাহ পাক তাঁর এই পরিশ্রম সফল করুন এবং এ দ্বারা বিদ্বেষী আলিমদের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

ইদ্রীস আহমদ

২০শে জানুয়ারী '৮৮

সেবনগর

উস্তাজুল আসাতিজা আল্লামা আব্দুর রব কাসিমী ফাযেলে দেওবন্দ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, কানাইঘাট মনসুরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট -এর

অভিমত

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) নিঃসন্দেহে একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। কারণ ইকামতে দ্বীন হল ইসলামের মূল। রাসূল (সাঃ)-এর দশ বৎসরের মাদানী জীবনের বিরামহীন জিহাদের ফলশ্রুতিতে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু এর সাথে ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি বরং কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের যত উম্মত দুনিয়াতে আসবেন প্রত্যেকের উপরই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়া ফরয কিন্তু খিলাফতে রাশেদার পর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম সমাজে রাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে ভাটা পড়তে আরম্ভ করে। এমনকি আমাদের এ উপমহাদেশের উপর ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারের পরক্ষণেই এ এলাকার মুসলমানদের অন্তর থেকে ইকামতে দ্বীনের অনুভূতি দ্রুত সরতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে তারা ইসলামকে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত– যেমন নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদিতে সীমিত করে ফেলে। ইসলামী অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি তথা কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্রকে তারা অকেজো মনে করতে আরম্ভ করে (নাউযুবিল্লাহ)।

এহেন অন্ধকার পরিবেশে আল্লাহতায়ালা হযরত আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-কে ইকামতে দ্বীনের জেহাদের জন্য কবুল করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করেন এবং 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করে বাস্তব ক্ষেত্রে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন শুরু করেন- যে আন্দোলন বর্তমান বিশ্বে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। হ্যাঁ, তাঁকে গোমরাহ, কাদিয়ানী, খারিজী ইত্যাদি বলে ফতোয়া দেয়া হয়। এটা বিশ্বের চিরাচরিত নিয়ম। যতসব ওলী, কুতুব, মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ যাঁরাই এ বিশ্বে ইসলামের কাজ করে গেছেন, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই এ ধরনের ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

তবে ঐসব ফতোয়ার কিছু কিছু উত্তর দেয়াও ইসলামের এক জেহাদ। তাই আজীজুল কদর হযরত মাওলানা বশীরুজ্জামান সাহেব 'সত্যের আলো' নামক বই লিখে এর উত্তর দিয়েছেন। আমি বইটি আগাগোড়া মনোযোগের সহিত পড়েছি। মাশাআল্লাহ! মাওলানা সাহেব কোরআন, হাদিস, তাফসীর, ফেকাহ, উসূল ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে যা লিখেছেন এবং ইমামগণের চিন্তাধারা ও মতামতের যেসব হাওয়ালা দিয়েছেন, ওগুলো অকাট্য সত্য।

মাওলানা সাহেব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এক ফরজ আদায় করেছেন, তাই তাঁর শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে তাঁর জন্য দোয়াও করছি যে, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁকে বেশি বেশিভাবে দ্বীনের খেদমত করার তাওফিক দান করেন। আমীন!

৯ই নভেম্বর '৮৭ **মুহাম্মদ আব্দুর রব কাসেমী**

মাওলানা ইসহাক আল মাদানী

এম.এম. ফার্স্ট ক্লাস, এল.লিট.ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিনিধি, দারুল ইফতা, সৌদি আরব -এর

অভিমত

মনে করতাম মাওলানা মওদূদী শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে পরিচিত একজন প্রতিভাধর আলেম। কিন্তু মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক দেশের ছাত্রদের সাথে অধ্যয়নকালে জানতে পারি যে, তিনি বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। রাসূল (সাঃ)-এর শহর মদীনাতুত তাইয়্যেবার এ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনায় রত সৌদি, মিসরী, সুদানী ও সিরীয় ডক্টরদেরকে প্রশ্ন করে জানি যে, তিনি এ শতাব্দীর মুসলিম মনীষীদের অন্যতম।

আসলেও তাই। কেননা মাওলানা তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যুক্তিপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদের সৃষ্ট ধূম্রজাল ছিন্ন করে ইসলামী আদর্শের কালজয়ী রূপকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছেন। তার ক্ষুরধার লেখনী সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিষদাত চূর্ণ করে দিয়েছে। ইতিহাসের আলোকে তিনি সকল নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। নাস্তিকতাবাদী সভ্যতা এবং তদুদ্ভূত মতবাদসমূহের সাথে ইসলামী আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি বিশ্ব সমাজের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করেন যে, খোদাদ্রোহী সভ্যতাই সকল প্রকার অশান্তি, জুলম, শোষণ, নিস্পেষণ, ব্যভিচার, অবিচার এবং ব্যাপক যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান কারণ। আর যতদিন পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপায়ন কার্যকর না হবে ততদিন পর্যন্ত মানবতার প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

মাওলানার রচিত গ্রন্থসমূহ যখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করেছে তখন নাস্তিক্যবাদী মতবাদসমূহের ধারক ও বাহকরা তাদের ভরাডুবি দেখে তাঁর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা ইসলামী জাগরণের মূলোৎপাটন এবং জনমনে মাওলানার প্রতি বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত করার জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী আলেমদের আশ্রয় নেয়। কিছু নামধারী আলেম তাদের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে মাওলানার বিভিন্ন অভিমতকে বিকৃত করে আর বেশকিছু মিথ্যা অপবাদ তাঁর উপর আরোপ করে তাঁকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভুত

গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সরলপ্রাণ ও ধর্মভীরু বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে এ ধরনের কিছু বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা সম্পর্কে জনমনে এ বিভ্রান্তি দেখে সিলেটের প্রতিভাধর আলেম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সিলেট শহরের কুদরত উল্লাহ জামে মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা বশীরুজ্জামান সাহেব আল-কুরআন, আল-হাদিস ও বিভিন্ন যুগের মুসলিম মনীষীদের উক্তির আলোকে মাওলানার অভিমতসমূহ বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ বইটিতে স্বার্থান্বেষী মহলের ফতোয়ার অসারতা ও তাদের মিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে বন্ধুবর মাওলানার অনেক সাধনা করতে হয়েছে। এ নিরলস সাধনার জন্য তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ রইল।

আমি বইটি আদ্যোপান্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি। এ মূল্যবান ও তথ্যবহুল গ্রন্থটি শুধু মুসলমান জনসাধারণের সন্দেহ অপনোদনই করবে না বরং শ্রদ্ধাভাজন অনেক আলেমও এ গ্রন্থে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন বলে আশা রাখি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মাওলানা বশীরুজ্জামানের এ শ্রমটুকু সার্থক করুন এবং তাঁকে আরো দ্বীনের কাজ করার তাওফিক দিন। আমীন! আল্লাহ হাফিজ।

মোহাম্মদ ইসহাক আল মাদানী

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।
তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট,
সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ।
আর অন্যগুলো রূপক।
. সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে
তারা ফেতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে
তার 'কিতাবের(মধ্য থেকে রূপক অংশের অনুসরণ করে।
আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না।
আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী
তারা বলে– 'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।
এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।'
আর বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ
শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৩ঃ৭

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا و حبيب ربنا وطبيب قلوبنا واولنا ومولننا محمدا عبده ورسوله ـ اما بعد! فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار -

عصمت انبياء বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া

যে সমস্ত মাসআলার উপর ভিত্তি করে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-কে কাফির-পথভ্রষ্ট, খারিজী, কাদিয়ানী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে عصمت انبياء বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয় অন্যতম। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফহীমাত' দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর কিচ্ছা বর্ণনা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য

اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کرایکدو لغزشیں ہونے دی ہیں - تاکہ لوگ انبیاء کوخدانہ سمجھیں اورجان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں - خدا نہیں ہیں -

এবং এটি একটি সূক্ষ্ম রহস্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছে করে প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন সময় তাঁর হেফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু'একটি ভুল-ত্রুটি হতে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা না বোঝে এবং জেনে নেয় যে, এঁরা খোদা নন বরং মানুষ।

মাওলানার উল্লেখিত কথাগুলোই হচ্ছে তাঁকে এ জঘন্য ও মারাত্মক আখ্যায় আখ্যায়িত করার মূল কারণ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের মতের সাথে মাওলানার কথাগুলো মিলিয়ে দেখি সত্যিই কি তিনি এ ধরনের বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার যোগ্য?

আল্লামা তাফতাজানী (রহঃ) -এর অভিমত

আল্লামা সা'দুদ্দিন মাসউদ তাফতাজানী (রহঃ) তাঁর লিখিত 'শারহে আকাঈদে নাসাফী'তে (যে কিতাবটি এ উপমহাদেশের সরকারী, আধা সরকারী এবং কওমী মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয়) বলেন ঃ

ان الانبياء معصومون عن الكذب خصوصاً فيما يتعلق بامر الشرائع وتبليغ الاحكام وارشاد الامة - اما عمدا فبالاجماع واماسهوا فعند الاكثرين - وفى عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو انهم معصومون عن الكفر قبل الوحى وبعده بالاجماع وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية وانما الخلاف فى امتناعه بدليل السمع او العقل واماسهوا فجوزه الاكثرون - اما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائى واتباعه ويجوز سهواً بلاتفاق الامايدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه فينتهواعنه ـ هذا كله بعد الوحى واما قبله فلا دليل على امتناع صدورالكبيرة - (شرح العقائد للنسفى)

নবীগণ মিথ্যা হতে পবিত্র। বিশেষ করে শরীয়ত ও রিসালত প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তাঁরা মিথ্যা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ইচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত, তবে ভুলবশতঃ অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা হতে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে তাঁরা এই প্রকার মিথ্যা হতেও পবিত্র। অপরাপর যাবতীয় গুনাহ্ হতে নবীগণ পবিত্র হওয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে। তা এই যে, তাঁরা কুফরী হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। অহি আসার পূর্বে হোক কিংবা পরে। এতে কারও কোন মতভেদ নেই। অনুরূপভাবে তাঁরা জমহুর বা অধিকাংশ ওলামাদের নিকট ইচ্ছাকৃত কবিরা গুনাহ্ হতেও পবিত্র। হাশাবিয়া সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে। তবে মতভেদ রয়েছে এ কথার মধ্যে যে, কবিরা গুনাহ হতে পবিত্র থাকা ও বিরত থাকা কি বর্ণিত দলিলের দ্বারা প্রমাণিত, না বিবেকের দ্বারা। আর ভুলবশতঃ কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামাদের মত হল যে, তাহা জায়েয ও সম্ভব আছে। ছগিরা গুনাহ জমহুর ওলামাদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। কিন্তু জুব্বাই ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত এর বিপরীত। আর অনিচ্ছাকৃত ভুলের দ্বারা ছগিরা গুনাহ হওয়া সকলের ঐক্যমতে জায়েয আছে, কিন্ত যা ঘৃণিত স্বভাবের পরিচয় দেয় ঐ প্রকারের ছগীরা জায়েয নয়। যেমন-এক লোকমা চুরি করা ও ওজনে কম দেয়া এ ব্যাপারে মুহাক্কেক বা নির্ভরযোগ্য আলেমগণ শর্ত করেছেন যে, তাঁদেরকে এর উপর যেন সতর্ক করা হয় যাতে তাঁরা বিরত থাকতে পারেন। এসব মতভেদ অহি নাযিল হওয়ার পরের অবস্থায়। কিন্তু অহি নাযিল হওয়ার পূর্বে নবীগণ হতে কবিরা গুনাহ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব হওয়ার কোন দলিল নেই।

(দেখুন শারহে আকা'ঈদের নাসাফী, ইছমতের আম্বিয়া আলোচনা।)

আল্লামা তাফতাজানীর উল্লেখিত আলোচনা থেকে যে কথাগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায় সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. নবীরা সর্বাবস্থায় কুফরী হতে পবিত্র।

২. জমহুর ওলামাদের মতে তাঁরা ইচ্ছাকৃত কবিরা গুনাহ্ হতেও পবিত্র। কিন্তু ভুলবশতঃ কবিরা গুনাহ্ নবীদের থেকে হতে পারে।

৩. জমহুর ওলামাদের মতে নবীদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ্ হতে পারে।

৪. সকল ওলামাদের ঐক্যমতে নবীদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ হতে পারে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) -এর অভিমত

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর লিখিত 'ইছমাতুল আম্বিয়া' নামক কিতাবে বলেন ঃ

والذى نقول : ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد اما على سبيل السهو فهو جائز -

এবং আমরা যা বলি তা হচ্ছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে ইচ্ছাকৃত কবিরা এবং ছগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। কিন্তু ভুলবশতঃ কবিরা ও ছগিরা গুনাহ হতে পারে। [দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৮]

হযরত আদম (আঃ)-এর ইছমত সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) উল্লেখ করেন ঃ

وانما قلنا انه كان عاصيا لقوله تعالى (وعصى ادم ربه فغوى) وانما قلنا ان العاصى صاحب الكبيرة لوجهين : (احدهما) ان النص يقتضى كونه متعاقبا وهو قوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالدافيها) ولا معنى لصاحب الكبيرة الامن فعل فعلا يعاقب عليه - (وثانيهما) ان العصيان اسم دم فلايطلق الاعلى صاحب الكبيرة -

এবং আমরা বলি যে, তিনি আছী (অবাধ্য) ছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, 'আদম (আঃ) তাঁর রবের অবাধ্য হন অতঃপর পথভ্রষ্ট হন।'

আমরা আছীকে দু'কারণে কবিরা গুনাহগার বলি ঃ

১. কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আদম (আঃ) শাস্তিপ্রাপ্ত ছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তাকে দোজখে প্রবেশ করাবেন এবং ওখানে সে সদা সর্বদা থাকবে।' আর কবিরা গুনাহগার ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যে এমন কাজ করে, যে কাজের উপর তাকে শাস্তি দেয়া যায়।

২. ইছয়ান (অবাধ্যতা) এমন একটি খারাপ কাজের নাম যা কবিরা গুনাহগার ছাড়া অন্য কারও উপর প্রয়োগ করা হয় না। [দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৬]

আল্লামা আলুসী (রহঃ) -এর অভিমত

আল্লামা আলুসী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রহুল মা'আনীতে লেখেন ঃ

فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوزصدورها منهم عمدا بعد البعثة عند الجمهور على ماذكره العلامة التفتازاني- لثاني في شرح العقائد ويجوز صدورها سهوا بالاتفاق ـ

জুমহুর (অধিকাংশ) ওলামাদের মতানুসারে নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও নবীদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ হতে পারে। কিন্তু যা ঘৃণিত স্বভাবের পরিচয় দেয় ঐ ধরনের ছগিরা গুনাহ হতে পারে না। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ সকলের ঐক্যমতে হতে পারে। আল্লামা তাফতাজানী ও তাঁর শারহে আকাঈদে নাসাফীতে এভাবে উল্লেখ করেছেন। [দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৭৪, খণ্ড নং ১৬]

আল্লামা আলুসী কোরআন শরীফের আয়াত فعصى ادم ربه فغوى -এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন ঃ

ظاهر الاية يدل على ان ماوقع منه كان من الكبائر وهو المفهوم من كلام . ام لام

বাহ্যিকভাবে আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আদম (আঃ) থেকে যা সংঘঠিত হয়েছিল তা কবিরা গুনাহ ছিল। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর কথা থেকেও এমনটিই বুঝা যায়। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৭৪, খণ্ড নং ১৬)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) -এর অভিমত

মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'নামক কিতাবে থানবী সাহেবের অভিমত উল্লেখ করেন ঃ

حق تعالی نے انبیاء علیهم السلام کوجو مقام بلند اپنے قرب کا عطافر مایاهے.اوران کوتمام گناهوں سے معصوم بنایاهے - جس طرح یه انکی رحمت ونعمت هے اسی طرح کبهی کبهی انبیاء

علیہم السلام سے بعض معاملات میں زلت (لغزش) ہونے کے جو واقعات قران کریم میں مذکور ہیں وہ بھی عین حکمت ورحمت ہیں - ان میں ایك بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو انبیاء کی خدائی کاوہم وشبہ نہ ہونے لگے - زلات کے صدور اوران پرحق تعالی کی طرف سے تنبیہات یہ واضح کردیتی ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالی کے بندے ہی نہیں -

আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে তাঁর নৈকট্যের যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁদেরকে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন, যেমন এটা তাঁর রহমত ও নিয়ামত, তেমনিভাবে কোন কোন সময় নবীদের থেকে কোন কোন ব্যাপারে ভুল-ক্রটি হওয়ার যে ঘটনাসমূহ কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে এগুলোও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও রহমত। এর মধ্যে এক বড় ফায়দা এটাও যে, মানুষের মনে যেন নবীদের খোদা হওয়ার সন্দেহ না হয়। ভুল-ক্রটি হওয়া এবং এর উপর আল্লাহ তায়ালার সতর্ক করা এটাই পরিষ্কার করে দেয় যে, নবীরাও আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ৬৫)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! হযরত থানবী (রহঃ)-এর কথাগুলো মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর কথাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখুন শব্দ ও অর্থগত দিক দিয়ে প্রায় মিলে যাচ্ছে।

আমরা উল্লেখিত আলোচনা থেকে যে কথাগুলো স্পষ্টতঃ জানতে পারলাম সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, নবীদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছগিরা গুনাহ হতে পারে।

২. জমহুর ওলামাদের মতানুসারে নবীদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেও ছগিরা গুনাহ হতে পারে।

৩. জমহুর ওলামাদের মতানুসারে নবীদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহও হতে পারে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কিন্তু 'গুনাহ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলেছেন নবীদের থেকে 'লগজিশ' বা ভুল-ক্রটি হতে পারে। এতটুকু বলার কারণেই তাঁকে

কাফির, গোমরাহ, খারেজী, কাদিয়ানী আরও কত কিছু বলা হয়েছে। কবি কি সুন্দর বলেছেন ঃ

ہم آہ بھی کرتےہیں توھوجاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کر تےہیں توچرچانہئیں ھوتا

আমরা একটু আঃ! শব্দ করলেই তা হয়ে যায় বদনামের কারণ।
আর তারা হত্যা করলেও এর কোন সমালোচনা হয় না।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর কথাগুলোর উপর মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর সমালোচনা ও তার জবাব

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর কথাগুলোর উপর সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর লিখিত 'মওদূদী দস্তর' নামক কিতাবে লেখেন ঃ

اب فرمایئے کہ مذکورہ بالاعقیدہ (جوتفہیمات کی عبارت میں مذکورھے ہر نبی کے متعلق جن میں جناب رسول اللہ صلعم بھی داخل ہیں، کہاں تك اصول وعقائد اسلامیہ کےمطابق ھے - جس میں ہرنبی سے عصمت وحفاظت کااٹھا لینا اور بالارادہ ان سےلغزشیں کرادینامانا گیاھے؟ ایسی صورت میں توکوئی نبی بھی معیار حق نہیں رہ سکتا ھےاور نہ کسی نبی پرھمیشہ اعتماد ھوسکتاھے - جوحکم بھی ھوگااس میں یہ احتمال موجود ھےکہ کہیں وہ عصمت وحفاظت اٹہ جانےکےزمانے کا نہ ھو- اب بتلائیے ك اختلاف اصول ھےیافروعی ، اوربتلائیے کہ اسلامی جماعت اور اسکے بانی مسلمان ھیں یانہیں‌یانہیں ؟ (مودردی دستور)

'এখন বলুন উপরোল্লেখিত আকীদা (যা তাফহীমাতে উল্লেখিত আছে) যা প্রত্যেক নবী সম্পর্কে, যাঁদের মধ্যে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও আছেন, কতটুকু ইসলামের মূলনীতি ও আকীদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ? যাতে প্রত্যেক নবী থেকে

ইছমত এবং হেফাজত উঠিয়ে নেয়া এবং ইচ্ছে করে ভুল-ক্রটি করানো স্বীকার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কোন নবীই সত্যের মাপকাঠি থাকতে পারেন না এবং কোন নবীর উপর সর্বদা ভরসাও করা যায় না। যে হুকুমই হোক না কেন, এতে এ সন্দেহ থাকবে যে, হয়ত এটা ইছমত ও হেফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ের। এখন বলুন, এ মতভেদ মৌলিক না আংশিক এবং বলুন জামায়াতে ইসলামী এবং তার প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান কি না ?'

মাদানী (রহঃ)-এর সমালোচনা থেকে তিনটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

১. আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করে তাঁর হেফাজত উঠিয়ে প্রত্যেক নবী থেকে ভুল-ক্রটি হতে দিয়েছেন, এটা ইসলামী আকীদার বিরোধী।

২. এমতাবস্থায় কোন নবীই সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না এবং তাঁদের উপর কোন সময়ই ভরসা করা যায় না। কেননা তাঁদের প্রত্যেক হুকুমেই সন্দেহ থাকবে যে, হয়ত এটা হেফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ের।

৩. মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা মুসলমান নন।

হযরত মাদানী সাহেবের কথাগুলো কিন্তু মেনে নেয়া যায় না। কারণ ঃ

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে যে, ভুলবশতঃ নবীদের থেকে ছগিরা গুনাহ হতে পারে এবং জুমহুর ওলামাদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবেও ছগিরা গুনাহ হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি হেফাজত উঠানো না হয়, তবে বুঝা যাবে যে, একদিকে আল্লাহর হেফাজত আছে, আর অন্যদিকে নবীদের থেকে ভুল-ক্রটি তথা ছগিরা গুনাহ প্রকাশ পাচ্ছে, এটা কিন্তু অসম্ভব। কারণ এতে পরোক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালা হেফাজতের উপর পূর্ণ সক্ষম নন বলে প্রকাশ পায় (নাউজুবিল্লাহ!)। অতএব মানতেই হবে যে, যখনই নবীদের থেকে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তখন আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করে তাঁর হেফাজত উঠিয়ে তা করতে দেন।

২. মুহাক্কেক বা নির্ভরযোগ্য ওলামাদের মতানুসারে যখনই নবীদের থেকে কোন 'লগজীশ' হয় তখনই তাঁদেরকে অবহিত করা হয়, যাতে তাঁরা এ থেকে বিরত থাকেন। আল্লামা তাফতাজানী এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه -

মুহাক্কেক ওলামাগণ শর্ত করেছেন যে, তাঁদেরকে এর উপর (লগজিশের) যেন সতর্ক করা হয়।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেছেন ঃ

لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه فينتبهوا -

মুহাক্কেক আলেমগণ শর্ত করেছেন, তাঁদেরকে যেন এর উপর অবগত করানো হয় যাতে তাঁরা এ থেকে বিরত থাকেন।

[দেখুন–রুহুল মাআনী, খণ্ড নং-১৬, পৃষ্ঠা-২৭৪]

সাদরুশ শারিয়া (রহঃ) বলেন ঃ

هوفعل من الصغائر يفعله من غير قصد ولابد ان ينبه عليه (توضيح)

'লগজিশ' ছগিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু এটা অত্যাবশ্যকীয় যে, এর উপর যেন তাঁদেরকে অবগত করানো হয়।

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী সাহে ব(রহঃ) বলেন ঃ

ان سے بتقاضائے بشریت بھول چوك هو سكتی هے ، مگر الله تعالی اپنی وحی سے ان كی ان غلطیوں كی بھی اصلاح كرتا رهتا هے -

মানুষ হিসেবে তাঁদের থেকেও ভুল-ক্রটি হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ওহীর দ্বারা এ সমস্ত ভুল-ক্রটিরও সংশোধন করে থাকেন।

[দেখুন–সিরাতুন্নবী, খণ্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৭০]

কোরআন শরীফে এর অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই।

তাবুকের যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃত্রিম ওজর পেশ করে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর নিকট যুদ্ধে গমন হতে নিষ্কৃতি চেয়েছিল। রাসূল (সাঃ) স্বীয় স্বভাবজাত নম্রতা ও সহনশীলতার কারণে এরা মিথ্যে বাহানা করতেছে জেনেও তাদেরকে রোখছত দিয়ে দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা এটা পছন্দ করেন নাই এবং এরূপ নম্রতা সমীচীন নহে বলে সাথে সাথে ওহী দ্বারা তাঁকে সতর্ক করলেন।

عفاالله عنك لم اذنت لهم حتی يتبين لك الذين صدقواوتعلم الكذبين -

হে নবী, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন। তুমি কেন এ লোকদের অনুমতি দিলে? যদি না দিতে তাহলে তোমার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হত যে, কোন্ লোকেরা সত্যবাদী আর মিথ্যেবাদীদেরকেও জানতে পারতে।

[সূরা তওবা, আয়াত নং ৪৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের মৃত্যুর পর তার ছেলের অনুরোধে রাসূলে করিম (সাঃ) ঐ মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াতে উদ্যত হয়ে গেলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা ওহী দ্বারা তাঁকে সতর্ক করলেন এবং নামায পড়ানো থেকে বিরত রাখলেন।

ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبره - انهم كفروا

بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون -

তাদের কোন লোক মরে গেলে তার জানাযা তুমি কখনই পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর মরেছে তারা ফাসেক অবস্থায়।

[সূরা তওবা, আয়াত নং ৮৪]

রাসূলে করিম (সাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য মধু পান না করার কসম করেন। হালাল খাদ্য গ্রহণ না করার কসম করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য শোভন নহে, তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ওহী দ্বারা অবগত করলেন ঃ

يايها النبى لم تحرم ما احل الله لك - تبتغى مرضات ازواجك

والله غفور رحيم -

হে নবী! আল্লাহ্ তায়ালা যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন নিজের জন্য হারাম করলে? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতেছ? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সূরা তাহ্রীম, আয়াত নং ৯]

হযরত নূহ (আঃ) সেই ঐতিহাসিক তুফানের সময় তাঁর কাফের ছেলেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তা পছন্দনীয় হল না, তাই সাথে সাথে ওহী নাযিল করলেন ঃ

يانوح انه ليس من اهلك انه عمل غيرصالح - فلاتسئلن

ماليس لك به علم ط انى اعظك ان تكون من الجاهلين -

হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ কর না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

[সূরা হুদ, আয়াত নং ২৫]

হযরত মূসা (আঃ) যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন তখন নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন ঃ هذا من عمل الشيطان এটা শয়তানের কাণ্ড।

এ ছাড়াও কোরআন শরীফে অনেক উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং হযরত মাদানী (রহঃ)-এর এ কথা ঠিক নয় যে, 'এমতাবস্থায় কোন নবীই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না, তাঁদের উপর কোন সময়ই ভরসা করা যায় না, তাঁদের প্রত্যেক হুকুমেই সন্দেহ থাকে যে, হয়ত এটা হেফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ের।'

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ইছমতে আম্বিয়া সম্পর্কে কোন কথা কোরআন, হাদিস কিংবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার খেলাফ বলেননি। সুতরাং হযরত মাদানী (রহঃ)-এর কথা অত্যন্ত মারাত্মক যে, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা এবং মাওলানা মওদূদী মুসলমান নন। আমরা বলতে বাধ্য হব যে, উপরোল্লেখিত তিনটি ব্যাপারে মাদানী সাহেবের ইজতেহাদী ভুল হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যথার্থই এক মর্দে মুমিন এবং একথা বললে ভুল হবে না যে, বিংশ শতাব্দীর তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সুতরাং এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে 'মুসলমান নন' শব্দটি ব্যবহার করা মুসলিম মিল্লাতের দুর্ভাগ্যই বলতে হয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর ফতোয়াটি যদি মেনে নেয়া যায়, তাহলে আল্লামা তাফতাজানী (রহঃ), আল্লামা আলুসী (রহঃ), ইমাম ফকরুদ্দিন রাযী (রহঃ), হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), এমনকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামদের ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন?

معیارحق اور تنقید

সত্যের মাপকাঠি এবং যাচাই-বাছাই

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) 'সত্যের মাপকাঠি এবং যাচাই-বাছাই' সম্পর্কে যে আলোচনা রাখেন, সেটা তৎকালীন পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৩নং ধারার ৬নং উপধারায় লিখিত আছে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর আলোচনাটি নিম্নরূপ ঃ

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیارحق نہ بنائے، کسی کوتنقیدسے بالا ترنہ سمجھئے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلانہ ہوئے، ہرایك کوخداکے بنا ئے ہوئے اسی معیار کامل پرجانچےاورپرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اسکو اسی درجہ میں رکھے -

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করবে না। কারো অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত হবে না বরং আল্লাহ্‌র দেয়া এ পূর্ণ মাপকাঠির মাধ্যমে যাচাই ও পরখ করবে এবং এ মাপকাঠির দৃষ্টিতে যার যে মর্যাদা হতে পারে, তাকে সে মর্যাদাই দেবে।

মাওলানার এ আলোচনা থেকে দু'টি কথা স্পষ্টতঃ জানতে পারা যায় ঃ

১. আল্লাহর্‌ রাসূল (সাঃ) ছাড়া কেউ সত্যের মাপকাঠি নয়।

২. আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ছাড়া কেউ যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে নয়।

মাওলানার উল্লেখিত কথাগুলোর উপর কোন কোন মহল অভিযোগ করে বলেছেন যে, যদি এ কথাগুলো মেনে নেয়া যায় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সত্যের মাপকাঠি হচ্ছেন না এবং তাঁদের উপর তানকীদ বা যাচাই-বাছাই বৈধ হয়ে যায়। অথচ কোরআন ও হাদিসে তাঁদের অনেক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ অর্থাৎ

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ্র প্রতি। আর রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم -

অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তোমরা তাদের মধ্য থেকে যার অনুসরণ করবে হেদায়াত পাবে।

অতএব যারা এ আকিদা পোষণ করবে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সত্যের মাপকাঠি নন এবং যাচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধ্বে নন, তারা আহ্লে সুন্নাত ওয়ালা জামায়াতের বহির্ভুত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন, আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করে দেখি সত্যিই কি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এ কথাগুলো বলার কারণে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বহির্ভুত হওয়ার যোগ্য, না নিছক একটা অপবাদ মাত্র।

কোরআন শরীফের আলোকে মিয়ারে হক

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে এরশাদ করেছেন ঃ

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون
بالله واليوم الاخر- ذالك خيرواحسن تاويلاً -

যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখ। এটাই উত্তম এবং পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক।

[সূরা ঃ নিসা, আয়াত নং ৫৯]

এ আয়াতে একটি কথা লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা 'তোমরা' বলে যে সম্বোধন করছেন এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-ও রয়েছেন। সুতরাং স্পষ্টতঃ বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-সহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের একে অন্যের সাথে মতবিরোধ হতে পারে। একজন সাহাবীর সাথে যেমন অন্য একজন সাহাবীর মতবিরোধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহাবীর সাথে এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবী নন তারও মতবিরোধ হতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায় ফয়সালাকারী হবে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)। অতএব বুঝা গেল মিয়ারে হক বা

সত্যের মাপকাঠি আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল। যদি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে গায়রে সাহাবী (যিনি সাহাবী নন) তো দূরের কথা, একজন সাহাবীর অন্য সাহাবীর সাথে মতবিরোধের কোন অধিকার থাকত না, কিংবা মতবিরোধের সময় প্রত্যেক সাহাবী নিজ নিজ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার হুকুম হত এবং গায়ের সাহাবীকে বিনা দ্বিধায় সাহাবীর মতকে গ্রহণ করার উপর বাধ্য করা হত। অথচ আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন– মতবিরোধের সময় কেউ কারো মত গ্রহণ না করে বরং আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) যে ফয়সালা দেয় উভয় পক্ষকে তা মেনে নিতে হবে।

সুতরাং সত্যের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনে করিম এবং সুন্নতে রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম বা অন্য কেউ নন। কারণ মিয়ারে হক বলতে এ জিনিসকেই বুঝায়— যার অনুসরণ ও অনুকরণ তার সত্য হওয়ার প্রমাণ এবং যার বিরোধিতা তার বাতিল হওয়ার পরিচয় বহন করে। আর এটা ঐ জিনিসই হতে পারে যা নিশ্চিত সত্য এবং বাতিল হওয়ার এতে কোনরূপ আশংকা নেই। এবং এটা প্রকাশ্য যে, নিশ্চিত সত্য মাত্র দু'টি জিনিস, আল্লাহ্‌ তায়ালার কিতাব কোরআনে করিম এবং রাসূল করিম (সাঃ)-এর সুন্নাত। সুতরাং মিয়ারে হক শুধুমাত্র এ দুটোকেই মানতে হবে, অন্য কাউকে নয়।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-কে মিয়ারে হক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ঠিক এ কথাটাই বলেছেন ঃ

"ہمارے نزدیك معیارحق سے مرادوہ چیزھے جس سے مطابقت رکھنا حق ھو اور جس کے خلاف ھونا باطل ھو - اس لحاظ سے معیارحق صرف خداکی کتاب اوراسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ھے صحابہ کرام معیارحق نہیں ہیں بلک کتاب وسنت کے معیار پرجانچ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ھیں کہ وہ برحق ھیں - ان کے اجماع کوھم اسی بنا پر حجت مانتے ھیں کہ ان کا کتاب وسنت کی ادنی سی خلاف ورزی پربھی متفق ھوجانا ہمارے نزدیك ممکن نہیں ھے -

(ترجمان القران جلد ٥٦ عدد ٥)

মিয়ারে হক বলতে আমরা সেই বস্তুকে বুঝি, যার অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে 'হক' বা 'সত্য' নিহিত আছে এবং যার অবাধ্যতার মধ্যে 'বাতিল' বা

'অসত্য' নিহিত আছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সুন্নাতই হচ্ছে একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। সাহাবীগণ মাপকাঠি নন, বরং তারা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের মাপকাঠি অনুসারে সত্যের পূর্ণ অনুসারী। কোরআন ও হাদিসের মাপকাঠিতে পরখ করে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সাহাবাদের জামায়াত একটি সত্যপন্থী জামায়াত। তাঁদের ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে আমরা শরীয়তের প্রামাণ্য দলিলরূপে এজন্যে মেনে থাকি যে, কোরআন ও হাদিসের সাথে সামান্যতম বিরোধমূলক বিষয়েও সকল সাহাবাদের একমত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

[দেখুন— তরজমানুল কোরআন, জিলদ — ৫৬, সংখ্যা —৫]

হাদিসের আলোকে মিয়ারে হক

عن مالك بن انس رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تم مسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

হযরত মালিক বিন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন— 'আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দুটো জিনিসকে শক্তভাবে ধারণ করবে ততক্ষণ তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব তথা কোরআন শরীফ এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।'

উক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথে থাকতে হলে মানুষকে কেবলমাত্র এ দুটোই শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। এ দুটোর অনুসরণের মধ্যেই সত্য নিহিত এবং বিরোধিতার মধ্যে বাতিল নিহিত। সুতরাং মিয়ারে হক শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-ও যদি মিয়ারে হক হতেন, তাহলে উক্ত হাদিসে রাসূল (সাঃ) কিতাব ও সুন্নাহ উল্লেখ করার পর পরই তাঁদের কথা উল্লেখ করতেন।

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যদি মিয়ারে হক হতেন তাহলে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কথা বা অভিমত শরীয়তের মধ্যে দলিল হিসেবে গণ্য হত। অথচ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত শরীয়তে দলিল হিসেবে গণ্য হয় না। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের অভিমত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ্ ইমাম সারাখসী (রহঃ) -এর অভিমত

وانما كان الاجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجماع عليه وانما يظهر هذا فى قول الجماعة لا فى قول الواحد - الاترى ان قول الواحد لايكون موجبا للعلم وان لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه (كتاب الاصول ج)

সাহাবাদের ইজমা (ঐক্যমত) এজন্যই দলিল হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে যে, সবাই একটি ব্যাপারে একমত হওয়াতে এর সত্যতা নির্ভুলভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এক জনের কথায় তা হয় না। তুমি কি দেখো না, এক জনের কথায় সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয় না, যদিও এর কেউ বিরোধিতা না করে।

[দেখনু - কিতাবুল উসুল, ১ম , সাহাবাদের ইজমা সম্পর্কীয় আলোচনা।]

ইমাম সারাখসী (রহঃ) আরও বলেন ঃ

قد ظهر من الصحابة الفتوى بالراى ظهورا لايمكن انكاره والراى قد يخطى فكان فتواى الواحدمنهم محتملا مترددا بين الصواب والخطاء والايجوزترك الراى بمثله كما لايترك القياس بقول التابعى -

অভিমত হিসেবে কোন সাহাবার কাছ থেকে কোন ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে এবং এটা এমন স্পষ্ট কথা যা অস্বীকার করা যায় না। আর অভিমত অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে। অতএব সাহাবীদের একজনের ব্যক্তিগত মত ভুল কিংবা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের অভিমতের বিরোধী মতও ত্যাগ করা যাবে না, যেমনিভাবে কোন তাবেয়ীর কথায় কিয়াসকে ত্যাগ করা যায় না।

[দেখুন - কিতাবুল উসুল, ২য় , পৃষ্ঠা নং ১০৫]

দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রহঃ) -এর অভিমত

ইমাম গায্যালী (রহঃ) المستصفى। গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় কাওলে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, অনেকের কাছে সাহাবীর মাযহাব স্বাভাবিকভাবে দলিলের সূত্র। আর অনেকের মতে কিয়াস বহির্ভূত মাসআলায় তা

দলিল হিসাবে গণ্য এবং অনেকের কাছে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর কথা দলিল হিসেবে গৃহীত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

والكل باطل عندنافان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته فلاحجة فى قوله - فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور بعصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقداتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكرابوبكررض وعمر رض على من خالفهما بالادجتهاد بل اوجبوا فى مسائل الاجتهاد على كل مجتهد ان يتبع اجتهاد نفسه - فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع اختلاف بينهم وتصريحهم بجوازمخالفتهم فيه ثلثه ادلة قاطعة -

আমাদের কাছে এসব কথা বাতিল বলে গণ্য। যে ব্যক্তির ভুল হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার নিষ্পাপ ও নির্ভুল হবার কোন প্রামাণ্য দলিল নেই তার কথা দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে না। কাজেই সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা কিভাবে দলিল হতে পারে? অথচ তাঁদের ভুলের সম্ভাবনা আছে। আর দলিলে মুতাওয়াতির বা আসমানী দলিল ছাড়া কিভাবে তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করা যেতে পারে? তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাদের দলকে নিষ্পাপ বলে ধারণা করা যায়? আর দু'জন মাসুম বা নিষ্পাপ ব্যক্তির মধ্যে মতপার্থক্য সম্ভব হয় কেমন করে? তা ছাড়া সাহাবারা নিজেরাই তো তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য বৈধ হবার ব্যাপারে একমত। আবু বকর ও উমর (রাঃ) পর্যন্ত তাঁদের বিরোধী মতের ইজতেহাদের অস্বীকার করেননি বরং মুজতাহিদ যেন ইজতেহাদী মাসআলায় তার এজতেহাদের অনুসরণ করে এটা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং সাহাবাদের নিষ্পাপ দলিল না থাকা, তাঁদের পরস্পরের বিরোধিতা বৈধ হওয়া এবং তাঁদের নিজেদেরই একথা বলে দেয়া যে, তাঁদের বিরোধিতা করা বৈধ–এ তিনটি কথাই আমাদের জন্য অকাট্য দলিল।

এরপর ইমাম গায্যালী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর দু'টি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমটি হলো, যদি কোন সাহাবীর কথা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এর বিরুদ্ধে কোন মত পাওয়া না যায়, তাহলে এর অনুসরণ করা জায়েয, ওয়াজিব নয়।

পরবর্তীতে তিনি নতুন মত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

لايقلد العالم صحابيا كما لايقلد عالما اخر -

অর্থাৎ কোন আলেম যেমন অন্য কোন আলেমের তাকলীদ বা অনুসরণ করেন না ঠিক তেমনি কোন সাহাবীরও যেন তাকলীদ না করেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) আরও বলেন ঃ

وهوالصحيح المختارعندنا اذ كل مادل على تحريم ، تقليد العالم للعالم لايفرق فيه بين الصحابى وغيره -

এইটিই আমাদের কাছে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য কথা। কারণ যে সমস্ত দলিলের ভিত্তিতে এক আলেমের জন্য অন্য আলেমের তাকলীদ হারাম প্রমাণিত হলো, সেগুলোর ব্যাপারে একজন সাহাবীও একজন গায়রে সাহাবীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না।

যারা সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিস দ্বারা তাঁদের অনুসরণ করা জায়েয ও কর্তব্য বলে দলিল পেশ করেন, সেসব দলিলের জবাবে ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন ঃ

قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقادفى عملهم ودينهم ومحلهم عندالله تعالى ولايوجب تقليدهم لاجوازا ولا وجوبا-

আমরা সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসসমূকে তাঁদের প্রশংসা জ্ঞাপক দলিল হিসেবে মনে করি। সেগুলো দ্বারা তাঁদের আমল, দ্বীনদারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসবের মাধ্যমে তাঁদের অন্ধ অনুসরণ করা জায়েয ও কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয় না।

জবাবের শেষাংশে তিনি বলেন ঃ

كل ذلك ثناء لايوجب الاقتداء اصلا -

এসব প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপক দলিলের দ্বারা অনুসরণ করা কর্তব্য এটা প্রমাণিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর অভিমত

وقال الشافعى رح فى قوله الجديد لايقلد احد منهم اى لايكون قوله دليلا وان كان لايدرك بالقياس

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সর্বশেষ মতামত এই যে, সাহাবীদের কারও অনুসরণ করা যাবে না, অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিগত কথা শরীয়তের মধ্যে কোন দলিল নয়। ঐ সমস্ত মাসআলাওগুলোতেও কিয়াসের কোন দখল নেই।

(দেখুন - مقدمة فتح الملهم)

ইমাম শওকানী (রহঃ) -এর অভিমত

ইমাম শওকানী (রহঃ) তাঁর ارشا الفحول গ্রন্থের الاستدلال নামক সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে কাওলে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

والحق انه ليس بحجة فان الله سبحانه تعالى لم يبعث الى هذه الامة الانبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد - وجميع الامة مامور باتباع كتابه وسنة نبيه ولافرق بين الصحابة ومن بعدهم فى ذلك - كلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لايثبت -

সত্য কথা হলো যে, সাহাবীর ব্যক্তিগত কথা শরীয়তের কোন দলিল নয়। কেননা মহান আল্লাহ্ তায়ালা এ উম্মতের প্রতি মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে প্রেরণ করেননি। তিনি আমাদের একমাত্র রাসূল (সাঃ) আর কিতাবও আমাদের জন্য মাত্র একটি। সমস্ত উম্মতকে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবী ও গায়রে সাহাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই শরীয়তী বিধানের আওতাধীন এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুসরণে সমানভাবে আদিষ্ট। যারা বলেন যে, আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে দলিল কায়েম হতে পারে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে একটি প্রমাণহীন কথা বলেন।

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ (রহঃ) -এর অভিমত

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ (রহঃ) তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে التنبيه على مسائل শিরোনামের একটি পরিচ্ছেদে বলেন ঃ

قدصح اجماع الصحابة كلهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين اولهم عن اخرهم واجماع تابعي التابعين اولهم عن اخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احدالى قول انسان منهم او ممن قبلهم فيأخذه كله ـ

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ঐক্যমতে প্রমাণিত যে, তাদের কোন একজনের পক্ষে ও তাঁদের মধ্য থেকে কিংবা তাঁদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কথা দ্বিধাহীনভাবে ও অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

অতঃপর তিনি বিভিন্ন ইমামগণের অভিমত পেশ করেন।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর অভিমত

ما من احد الا وهوماخوذ من كلا مه ومردود عليه الا رسول الله -

একমাত্র রাসূল (সাঃ) ছাড়া এমন কোন লোক নেই, যার কথা কিছু গ্রহণযোগ্য ও কিছু বর্জনযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর অভিমত

لاحجة فى قول احددون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثروا -

'রাসূল ছাড়া অন্য কারো কথা দলিল হতে পারে না, যদিও তারা সংখ্যায় বেশী হন।'

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) -এর অভিমত

ليس لاحد مع الله ورسوله كلام-

'কারো কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার সমান হতে পারে না।'

মাওলান মওদূদী (রহঃ)-এর প্রতিপক্ষের দলিলের অসারতা

যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের মিয়ারে হক বলে দাবী করেন, তারা নিম্নের হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

'রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যাঁকেই অনুসরণ করবে হেদায়েত পাবে।'

এ হাদিসটি আসলে একটি জয়ীফ বা দুর্বল হাদিস। আর জয়ীফ হাদিস কখনও দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এটা সর্বসম্মত কথা। হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে আব্দুল বার তাঁর লিখিত

"جامع بيان العلم" নামক কিতাবে এ হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

هذا اسناد لاتقوم به حجة অর্থাৎ এ হাদিসটির সনদ এমন যার উপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ের দলিল হিসেবে এটাকে পেশ করা যায় না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাযম বলেন ঃ

هذه رواية ساقطة خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط -

এটি হচ্ছে একটি পরিত্যক্ত বর্ণনা, একটি মিথ্যে মনগড়া জালিয়াতিপূর্ণ এবং অসারতাপূর্ণ বাতিল খবর। এর সত্যতা কোন কালেই প্রমাণিত হয়নি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন বলেন ঃ

এ হাদিসটির যাবতীয় সনদই দুর্বল। [দেখুন - تخريج كشاف]

ইমাম শওকানী বলেন ঃ

فيه مقال معروف অর্থাৎ এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বিশেষ কথাবার্তা ও মন্তব্য রয়েছে। [দেখুন - ارشاد الفحول ص ۸۳]

তিনি আরো বলেন, এর একজন রাবী অত্যন্ত দুর্বল এবং ইবনে মুঈনের মতে মিথ্যাবাদী। ইমাম বুখারীর নিকট সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। ইমাম বুখারী এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

انه منكرالحديث - অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি হাদিস শাস্ত্রে অপরিচিত ব্যক্তি।

ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ ضعيف অর্থাৎ সে খুবই দুর্বল।

বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) এ হাদিসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেছেন ঃ لايساوى فلسا

অর্থাৎ এ হাদিসটির বর্ণনাকারীর মূল্য এক পয়সারও সমান হতে পারে না।

হাফেজ ইবনে কাইয়ুম (রহঃ) বলেন ঃ

اعلام الموقعين নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে القول فى التقليد অধ্যায়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ রেওয়াতটি মোটেই শুদ্ধ নহে।

এ ছাড়াও মাওলানার প্রতিপক্ষরা সাহাবায়ে কেরামদের ফযীলত সম্পর্কিত কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত ও এ হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। এগুলো সম্পর্কে ইমাম গায্যালীর জবাব একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক ভাইদেরকে তাদের দৃষ্টি একটু পিছনে নিয়ে ঐ জবাবটি দেখে নেয়ার অনুরোধ জানাই।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া কেউই সত্যের মাপকাঠি নয়। কারো ব্যক্তিগত কথা কিংবা অভিমত অবশ্য পালনীয় নয়। সুতরাং মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর কথ– 'আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না' এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার বিরোধী কোন কথা নয় এবং একথা বলার কারণে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বেরও হননি। বরং মাওলানার কথাই যথার্থ কথা। যারা সাহাবায়ে কেরামদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলে দাবী করেন তারা প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবা (রাঃ)-কে রাসূল (সাঃ)-এর সমমর্যাদায় নিয়ে যান।

উপমহাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র

আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) -এর ফতোয়া

کلمہ اسلام کے دوسرے جزو" محمدرسول اللہ " کے معنی یہ ہیں کہ اب معیار حق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسان نہیں ہے - اس لئے یہ عبارت ہرمرد مومن وسلم کا عقیدہ ہونا چاہئے - امام مالك (رح) کاقول ہے "لیس مناالاحدالاراد ومردود الاصاحب ھذا القبرالکریم" ظاہرہے کہ امام مالك کی مرادغیرانبیاء ہیں - یہی مراد اس عبارت کی ہے - اسے خواہ مخواہانبیاء و اولیاء کی توہیں وتکذیب نکالنا زبردستی ہے -

(جماعت اسلامی اسی ٨٠ علماء کی نظر میں)

কালেমায়ে ইসলামের দ্বিতীয় অংশ محمد رسول الله এর অর্থ এই যে, এখন একমাত্র আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া অন্য কেউ সত্যের মাপকাঠি নয়। এজন্য উক্ত ধারণা প্রত্যেক মুসলমান মাত্রেই আকিদা হওয়া উচিত।

ইমাম মালিক (রহঃ) রাসূলে করিম (সাঃ)-এর কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এই কবরে যে মহান ব্যক্তি শায়িত আছেন, তিনি ছাড়া অন্য সবার কথা যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে।

একথা পরিষ্কার যে, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর এ কথার অর্থ নবী ছাড়া অন্য সবাই সত্যের মাপকাঠিতে উন্নীত নয়। এ থেকে অহেতুক নবী-ওলিদের অবমাননা বের করা জুলুম।

[দেখুন, ৮০ জন ওলামার দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামী]

তাফসীরে মাজেদীর লেখক
মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদীর অভিমত

آپ نے بنیادی عقیدہ کی جو عبارت نقل کی ھے وہ عین حق وصواب ھے اور ہرمسلمان کا یہی عقیدہ ھونا چاہیئے - رسول خدا کو معیارحق بناھے کے معنی یہ ہیں کہ سارے انبیاء کی تصدیق اس میں آگئی - معترض کوشایدتنقید اورتوھین وتنقیص کے درمیان فرق نہیں معلوم- محدثین نے کس غضب کی تنقید رواۃ پرکی ھے - کیا وہ سب توھین وتنقیص کے مرتکب ھوئے ھیں - علی ھذا معترض کو پیروی وذھنی غلامی کے درمیان بھی فرق نہیں معلوم ؛ پیروی تواپنے استادکی باپ کی، اورصالح بزرگ کی کی جاسکتی ھے - ذھنی غلامی یعنی بے چوں و چراانقیاد کامل کاحق صرف رسول معصوم کاہے-

(جماعت اسلامی اسی ۸۰ علماء کی نظر میں)

আপনি মৌলিক আকিদা সম্পর্কীয় যে উদ্ধৃতিটি পাঠিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক এবং প্রত্যেক মুসলমানের এই আকিদা হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র রাসূলকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করার ভিতর দিয়ে অন্যান্য নবীদের স্বীকৃতিও এসে গেছে। প্রশ্নকারীর সম্ভবতঃ তানকীদ (যাচাই) এবং তাওহীন (অসম্মান)-এর মধ্যে ব্যবধান জানা নেই। মোহাদ্দিসীনরা হাদিস বর্ণনাকারীদের কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করেছেন, এতে কি তারা সাহাবায়ে কেরামদের অসম্মানকারী হয়ে গেলেন? অনুরূপভাবে প্রশ্নকারীর সম্ভবতঃ অনুসরণ ও অন্ধ অনুকরণের পার্থক্য জানা নেই। অনুসরণ তো উস্তাদ, পিতা-মাতা এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের করা হয়ে থাকে আর অনুকরণ একমাত্র নিষ্পাপ রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কারো হয় না।[

[দেখুন, ৮০ জন ওলামার দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামী]

تنقید বা যাচাই-বাছাই

তানকীদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে পুনর্বার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য

"رسول خداکے سوا کسی انسان کو معیارحق نہ بنائے - کسی کوتنقیدسے بالا تر نہ سمجھے" -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করবে না।

মিয়ারে হক-এর মাসআলায় কোন কোন মহল যে অভিযোগ পেশ করে থাকেন, 'তানকীদ'-এর মাসআলায়ও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে যদি যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে না করা হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের উপর তানকীদ বা যাচাই-বাচাই বৈধ হয়ে যায়। অথচ এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার সম্পূর্ণ খেলাপ। যারা এরূপ আকিদা পোষণ করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভুত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করে দেখি সত্যিই কি মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর অভিমত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভুত? তবে আলোচনার পূর্বে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। সেটা হল, এ মতবিরোধ সাহাবায়ে কেরাম (রহঃ)-দের ব্যক্তিগত মত ও ইজতেহাদের ব্যাপারে। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের ইজমা বা ঐক্যমত যেমন মাওলানার প্রতিপক্ষ যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করেন, তেমনি মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-ও মনে করেন।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এ ব্যাপারে বলেন ঃ

انکے اجماع کوهم اسی بناپر حجت مانتے ہیں کہ ان کاکتاب وسنت کی ادنی اسی خلاف ورزی پربھی متفق هوجانا ہمارے نزدیك ممکن نہیں -

(ترجمان القرآن جلد- ٥٦ عدد - ٥)

অর্থাৎ, তাঁদের (সাহাবায়ে কেরামদের) ঐকমত্য আমরা শরীয়তের প্রামাণ্য দলিলরূপে এজন্য মেনে থাকি যে, কোরআন ও হাদিসের সাথে সামান্যতম বিরোধমূলক বিষয়ে সকল সাহাবাদের একমত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

[দেখুন তরজমানুল কোরআন, জিলদ-৫৬, সংখ্যা-৫]

সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হচ্ছে, এ মতবিরোধ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- দের ব্যক্তিগত মত ও ইজতেহাদের ব্যাপারে।

এ ব্যাপারে আসুন, আমরা তানকীদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করি।

আরবী ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান যেমন– লিসানুল আরব, আলমুনযিদ, কামুস প্রভৃতি অভিধানে তানকীদ শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে– ভাল এবং মন্দের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে পার্থক্য করা যে, কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ। অবশ্য তানকীদ শব্দ কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেহেতু শরীয়ত কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেহেতু মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্যে তানকীদ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার কোন অবকাশই নেই। মওদূদী (রহঃ)-ও এ ব্যাপারে আলোকপাত করে বলেছেন ঃ

تنقید کے معنی عیب چینی ایك جاہل آدمي توسمجه سکتاهے - مگرکسی صاحب علم آدمی سے یه توقع نہیں کی جا سکتی هے که وه اس لفظ کایه مفہوم سمجهیگا- تقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے هیں، اور خود دستورکی مذکوره بالا عبارت میں اس معنی کی تصریح بهی کردیگئی هے - اسکے بعد عیب چینی مراد لینے کی گنجائش صرف ایك فتنه پرواز آدمی هی اس لفظ سے نکال سکتا هے -

তানকীদ শব্দের অর্থ 'দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা' এক মুর্খ ব্যক্তি বুঝতে পারে কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তিনি এ শব্দের অর্থ এটা বুঝবেন। তানকীদ শব্দের অর্থ যাচাই-বাছাই করা। এমনকি গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত বক্তব্যে এর বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। এরপর 'দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা' এ অর্থ শুধুমাত্র একজন ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিই এ শব্দ থেকে বের করতে পারে।

[দেখুন : رسالہ "کیا جماعت اسلامی حق پرھے"]

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এক অভিযোগকারীর উত্তরে আরও বলেন ঃ

تنقید کا لفظ جس معنی میں آپ نے اعتراض عـــ۱۳ میں استعمال فرمایا ھے اس معنی میں صحابہ کرام رضـ توکجاکسی ادنی سے ادنی درجے کے مسلمان پربھی تنقید کرنا میرے نزدیك سخت گناہ ھے -

তানকীদ শব্দের যে অর্থ (দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা) আপনি আপনার ১৩ নং অভিযোগে পেশ করেছেন, এ অর্থে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুসলমানের তানকীদ করা আমার নিকট অত্যন্ত বড় গুনাহ।

[দেখুন–তরজমানুল কোরআন, ১৯৫৬ ইং, সংখ্যা-৩]

কোরআনের আলোকে তানকীদ

কোরআন শরীফ থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি যে, একমাত্র নবী-রাসূলগণ সকল প্রকার তানকীদ বা যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে। তাঁদের প্রত্যেক হুকুম এবং ফয়সালা উম্মতদের জন্য বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া ওয়াজিব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وما كان بمؤمن ولامؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ط ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناًہ (سورہ احزاب)

'কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন তখন সে নিজে সে ব্যাপারে ফয়সালা

করার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।' [সূরা আল-আহযাব]

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, নবী বা রাসূলের ফয়সালার উপর কোন মুমিনের তানকীদ করার অধিকার নেই। তানকীদ তো দূরের কথা, তানকীদের দৃষ্টিতে দেখা পর্যন্ত জায়েয নয়। যদি দেখে তাহলে ঈমান থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিনই হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার জীবনের প্রতিটি ব্যাপরে একমাত্র রাসূল (সাঃ)-কে ফয়সালাকারী না মানবে, প্রত্যেক অবস্থায় রাসূলের অনুসরণকে নিজের মুক্তির উপায় মনে না করবে।

আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا

فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - (سوره نساء)

'না হে মুহম্মদ! তোমার রব-এর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে হাকিম বা বিচারপতি না মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা-ই ফয়সালা করবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং এর সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।' (সূরা আন- নিসা)

এ আয়াত থেকেও বুঝা গেল যে, একমাত্র রাসূল (সাঃ)-ই এ মর্যাদার অধিকারী যিনি সকল প্রকার তানকীদের উর্ধ্বে এবং তিনিই একমাত্র মিয়ারে হক।

এখন প্রশ্ন থাকল রাসূলের উম্মদের ব্যাপারে যে, তারাও কি রাসূলের সমান মর্যাদার অধিকারী এবং তারাও কি সকল প্রকার তানকীদের উর্ধ্বে? এ ব্যাপারে কোরআন শরীফ থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে যে মর্যদা দান করেছেন, তা কখনও কোন উম্মতকে দান করেননি। উম্মতের মধ্যে যিনি যত মর্যাদার অধিকারী হোন না কেন, তার ব্যক্তিগত অভিমত কিংবা ইজতেহাদী ফয়সালা শরীয়তের মধ্যে না দলিল হিসেবে গ্রহণীয় এবং না অবশ্য অনুসরণীয় তাদের প্রত্যেক অভিমতও।

ফয়সালা যে কোরআন ও হাদিসের মাপকাঠি সে মাপকাঠির সাথে যাচাই করে দেখা হবে। যদি মাপকাঠির অনুরূপ হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে, আর যদি বিপরীত হয় তাহলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কোরআন শরীফে বর্ণিত হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনা থেকে এ কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোরআন শরীফে তাঁদের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندناوعلمنه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معى صبرا - وكيف تصبرعلى مالم تحط به خبرا - قال ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا - قال فان اتبعنى فلا تسئلنى عن شئ حتى احدث لك منه ذكراً - قال فان اتبعنى فلا تسئلنى عن شيئ حتى احدث لك منه ذكرا - فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها ط قال اخرقتهالتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا - قال الم اقل انك لن تستطيع معى صبرا - قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من امرى عسرا - فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس ط لقد جئت شيئا نكرا - قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا - (سوره كهف)

আর সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য হতে একজন বান্দাহকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং নিজেদের তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম। মুসা তাকে বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি? যেন আপনি আমাকেও সে জ্ঞান শিক্ষা দেন, যা আপনাকে শিখানো হয়েছে।

তিনি জবাব দিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, আপনি সে বিষয়ে ধৈর্যইবা ধারণ করতে পারবেন কিভাবে?

মুসা বললেন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। আর কোন ব্যাপারে আমি আপনার হুকুমের খেলাপ করব না।

তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সাথে চলতে থাকেন তাহলে আপনি আমার নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজেই সে বিষয়ে আপনার নিকট বলি।

এতক্ষণে তারা দু'জন রওয়ানা হলেন। পরে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি নৌকায় ফাটল করে দিলেন।

মুসা বললেন, আপনি এতে ফাটল করে দিলেন যাতে সকল আরোহীকেই ডুবাতে পারেন? আপনার এ কাজটি তো বড় অসুবিধাজনক!

তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না?

মুসা বললেন, ভুল হলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না।

পরে তারা দু'জন আবার চলতে লাগলেন। তারা একটি বালককে দেখতে পেলেন। পরে তিনি তাকে হত্যা করলেন।

মুসা বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন, অথচ সে তো কাকেও হত্যা করেনি। আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন!

তিনি বললেন, আমি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে চলতে পারবে না? (সূরা আল-কাহাফ)

কোরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, হযরত খিযির (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা এক বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, যে জ্ঞান হযরত মুসা (আঃ)-এর ছিল না। অন্য দিকে মুসা (আঃ) ছিলেন এক উচ্চ মর্যাদাশীল নবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথা বলার যাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল, সে সৌভাগ্য হযরত খিযির (আঃ) লাভ করতে পারেননি।

কিন্তু হযরত খিযির (আঃ) যখন এমন দুটো কাজ (নৌকায় ফাটল করা ও বালককে হত্যা) করে বসলেন, যা হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের মধ্যে জায়েয ছিল না, সাথে সাথে হযরত মুসা (আঃ) বিনা দ্বিধায় হযরত খিযির (আঃ)-এর মত এতবড় জ্ঞানী ব্যক্তির তানকীদ করে বসলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র নবী বা রাসূল ছাড়া কেউ তানকীদ বা যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে নন। যিনি যত বড় আলেম, বুজুর্গ কিংবা ওলি হন না কেন, প্রত্যেকের কথা ও কাজকে আসমানী শরীয়তের মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করা হবে। যদি মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তবে গ্রহণ করা হবে নতুবা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

হাদিসের আলোকে তানকীদ

হাদিসে রাসূলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং বড় বড় ওলামায়ে কিরামের উপর তানকীদ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে তারা নিজেকে অপরের সামনে তানকীদের জন্য পেশ করেছেন এবং

এটাকে নিজের জন্য অসম্মানজনক মনে করা তো দূরের কথা বরং এ ধরনের তানকীদকে দ্বীনের হেফাজত বলে মনে করতেন।

নিম্নে আল্লাহর রাসূলের হাদিস থেকে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে যাতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে একে অন্যের কথা ও কাজের উপর তানকীদ করা ও শরীয়তের মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ এবং রাসূল (সাঃ) ব্যতীত কেউ এর উর্ধ্বে নন।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উপর ইবনে উমর (রাঃ)-এর তানকীদ

ইমাম তিরমিজী (রহঃ) এ তানকীদ বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তাহলো এই যে –

ان رجلا من اهل الشام سأل عبدالله بن عمر رضـ عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال حلال فقال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال ارأيت ان كان ابى قد نهى عنها وصنعها رسول الله امرابى يتبع ام امررسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بل امررسول الله فقال فقال قد صنعهارسول الله صلى الله عليه وسلم -

(قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح)

ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন যে, সিরিয়ার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ্বে তামাত্তু উমরাহ সহকারে হজ্ব পর্যন্ত করা জায়েয না হারাম?

ইবনে উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, জায়েয এবং হালাল।

এর উপর সিরীয় ব্যক্তিটি অভিযোগ করে বললো, আপনার আব্বা হযরত উমর (রাঃ) তো এটাকে নাজায়েয বলেছেন!

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, তুমি বল আমার পিতা হযরত উমর (রাঃ) যদি এটাকে নাজায়েয বলেন এবং রাসূলে করিম (সাঃ) যদি নিজে এটা করেন, তবে কার অনুসরণ করা যাবে, আমার পিতা উমরের না রসূলে করিম (সাঃ)-এর?

সিরীয় ব্যক্তিটি উত্তরে বললো অনুসরণ তো রাসূল করিম (সাঃ)-এর কথা ও কাজের করা যাবে।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এটা শুনে বললেন, রাসূলে করিম (সাঃ) হজ্ব ও উমরাহ্ একসাথে করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটু লক্ষ্য করুন। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন খলিফায়ে রাশীদ। যার মতের উপর কয়েকবার কোরআন শরীফের আয়াত নাযিল হয়েছে। যে দশজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দুনিয়াতে বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। কিন্তু হযরত ইবনে উমর (রাঃ) যখন দেখলেন তাঁর সম্মানিত পিতার কথা রাসূলে করিম (সাঃ)-এর কথার সম্পূর্ণ বিপরীত তখন তিনি সাথে সাথে তাঁর পিতার উপর তানকীদ করে বসলেন এবং এটাকে রাসূল (সাঃ)-এর কথার উল্টো পেয়ে প্রত্যাখান করলেন।

এতে বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যত জ্ঞানী ও সম্মানিত হোন না কেন, দ্বীনের হেফাজতের জন্য তার কথা ও কাজের তানকীদ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উপর একজন মহিলার তানকীদ

হযরত উমর (রাঃ) একদা মসজিদে নববীতে খুতবা দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বললেন ঃ

" لاتغالوابصدقات النساء فقالت امرآة انتبع قولك ام قول الله
واتيتم احد هن قنطارا الاية فقال عمر رض كل احد اعلم من
عمرتزوجوا على ماشئتم - (مدارك)

বিবাহে মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত মোহর নির্ধারিত করো না।

এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আপনার কথা মানব, না আল্লাহ্‌র কথা? আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন – 'অথচ তাদের মধ্যে কাউকে দিয়েছি অনেক সম্পদ।'

এর উপর হযরত উমর (রাঃ) বললেন প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তোমরা যে পরিমাণ সম্পদের উপর চাও বিবাহ্ কর।

(মাদারিক)

সাহাবায়ে কেরাম যদি মিয়ারে হক এবং সকল প্রকার তানকীদের উর্ধ্বে হতেন, তাহলে হযরত উমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তিত্ব যাঁকে দেখলে শয়তানও ভয়ে পালাত, অথচ একজন সাধারণ মহিলা তাঁর তানকীদ করতে পারলেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকম, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উপর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর তানকীদ

জুমআ এবং ঈদ একই দিনে হলে হযরত যায়েদ ইবনে আরকম, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত হল ঐ দিন জুমআ পড়া জরুরী নয় বরং শুধুমাত্র ঈদের নামাজ পড়লেই চলবে। নিম্নের হাদীসগুলো থেকে তাঁদের এ মতামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

عن اياس بن ابى رملة الشامى قال شهدت معاوية بن ابى سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم ؟ قال نعم ، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيدثم رخص فى الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل

(ابوداود جلد١ صـ١٥٣)

হযরত আয়াস বিন আবী রামলা শামী বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর খিদমতে এমন সময় উপস্থিত হলাম যখন তিনি হযরত যায়েদ বিন আরকমকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আপনার কি রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সাথে একই দিনে দুই ঈদ মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দিন রাসূলে করিম (সাঃ) কি করলেন ?

হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, ঈদের নামায পড়ালেন এবং জুমআর ব্যাপারে সুযোগ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি জুমআ পড়তে চায় সে যেন পড়ে নেয়।

[আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ -১৫]

عن عطاء بن ابى رباح قال صلى بنا ابن الزبير رض فى يوم عيدفى جمعة اول النهار ثم رحناالى الجمعة فلم يخرج الينافصلينا وحدانا - وكان ابن عباس رض بالطائف فلماقدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة -

(ابو داود جلد اول ١٥٣)

হযরত আতা বিন আবি রেবাহ (রাহ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) জুমআর দিন ঈদের নামায সকাল বেলা পড়লেন এবং জোহরের সময় যখন আমরা জুমআর জন্য গেলাম তখন তিনি আর বের হলেন না। সুতরাং আমরা একা একা নামায পড়লাম।

এ সময় ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে ছিলেন।

তিনি যখন ফিরে এলেন, আমরা হযরত ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর এ আমল বর্ণনা করলাম।

তিনি শুনে বললেন, ইবনে জুবাইর (রাঃ) সুন্নাতের উপরেই আমল করেছেন।
(আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)

قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطرعلى عهد ابن الزبير رض فقال عيدان اجتمعا فى يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهماركعتين بكرة لم يزدعليهماحتى صلى العصر-

(ابوداود جلد ١ صـ ١٥٣)

হযরত আতা বিন আবি রেবাহ (রহঃ) বলেন, একদা ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর সময়ে জুমআ এবং ঈদুল ফিতর একই দিনে হল। তিনি দুটোকে একত্র করে দু'রাকআতই অতি সকালে পড়ালেন এবং আসরের নামায পড়া পর্যন্ত এর অতিরিক্ত আর কোন নামায পড়লেন না।
(আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ - ১৫৩)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকম, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখিত মতামতের ভিত্তি হল নিম্নের হাদীসটি ঃ

عن ابى هريرة رضـ ان النبى صلى عليه وسلم قال قداجتمع فى يومكم هذاعيدان فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجتمعون -

(ابو داؤد جلد١ ص ١٥٣)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ঈদ এবং জুমআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলে করিম (সাঃ) বললেন, যারা জুমআর বদলে ঈদের নামাযের উপরই সন্তুষ্ট থাকতে চায় তারা এরূপ করতে পারে, কিন্তু আমরা জুমআও পড়ব।

হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মদ গাংগুহী (রহঃ) হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসের নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং হযরত যায়েদ বিন আরকম আবদুল্লাহ বিন জুবাইর ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর উপর তানকীদ করেন।

اتفق ذلك فى عهد النبى ص بانه وافق يومالجمعة يوم عيد وكان اهل القرى يجتمعون لصلوة العيد ين ما لا يجتمعون لغيرهما كماهو العادة فى اكثراهل القرى وكان فى انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من صلواة العيد خرج على اهل القرى - فلما فرغ رسول الله صلعم من صلواة العيد نادى مناديه من شاء منكم ان يصلى فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع وكان ذلك خطابا لاهل القرى (المجتمعين ثم - والقرينة على ذلك انه قد صرح فيه بانا مجتمعون - والمراد من جمع المتكلم فيه اهل المدينة فهذا يدل دلالة واضحة بان الخطاب فى قوله من شاء منكم ان يصلى الى اهل القرى لا الى اهل المدبنة -

(بذل المجهود جـ٢ صـ١٧٢)

রাসূলে করিম (সাঃ)-এর জামানায় একদা ঈদ এবং জুমআ একই দিনে হয়। গ্রাম্য লোক অন্যান্য নামাযের তুলনায় ঈদের নামাযে তাদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী বেশী আসতেন। ঈদের নামায শেষ করে জুমআর জন্য অপেক্ষা করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। তাই রাসূলে করিম (সাঃ) ঈদের নামায শেষ করে এক ঘোষণাকারীর মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি জুমআর নামায পড়তে চায় সে যেন এখানে অপেক্ষা করে জুমআ পড়ে এবং যে ব্যক্তি তার গ্রামে ফিরে যেতে চায় সে যেতে পারে।

রাসূলে করিম (সাঃ)-এর এ ঘোষণা শুধুমাত্র গ্রাম্য লোকদের জন্য ছিল, যারা ওখানে সমবেত হয়েছিল।

এর উপর দলিল হল এই যে, রাসূলে করিম (সাঃ) তাঁর বক্তব্যে 'আমরা জুমআ আদায় করব' পরিষ্কারভাবে বলেছেন। এখানে 'আমরা' শব্দ দিয়ে

মদীনাবাসীদেরকেই বুঝিয়েছেন এবং 'যে, ব্যক্তি নামায পড়তে চায়' বলে গ্রাম্য লোকদেরকেই বুঝিয়েছেন, মদীনাবাসীদের নয়।

[বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড – ২, পৃঃ – ১৭২]

এরপর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) উল্লেখিত তিন সাহাবীর তানকীদ করতে গিয়ে বলেন ঃ

واماابن عباس رضـ وابن الزبير رضـ فكانا اذ ذاك صغيرين غيرانهما سمعا المنادى النداء باذانهما وان لم يفهما ماريد به فاخرابن الزبير رضـ صلواة العيد الى ماقبل الزوال وقدم الجمعة - ولعله كان يرى جواز تقديم الجمعة على وقت الزوال كما يراه اخرون فصلى الجمعة وادخل فيه صلواة العيدفلذا لم يصل الظهر كما يدل عليه ظاهرالرواية - واماابن عباس رض فكان سمع باذنه ايضا ما نوى به فى ذلك الوقت فلذا قال فيه انه اصاب السنة اى ماسمعته منه صلى الله عليه وسلم من قوله من شاء فليصل -

(بذل المجهود ج-ص ۱۷۳)

ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবাইর (রাঃ) ঐ সময় ছোট ছিলেন। তাঁরা ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনেছেন, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই। অতএব ইবনে জুবাইর (রাঃ) ঈদের নামায দুপুরের নিকটবর্তী সময়ে পিছিয়ে এবং জুমআ একটু এগিয়ে এমনভাবে পড়েন যে, ঈদের নামায জুমআর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ফেলেন। কেননা হতে পারে তিনিও জুমআ দুপুরের পূর্বে জায়েয হওয়ার প্রবক্তাদের মধ্যে একজন। এজন্য তিনি এদিন জোহরের নামায পড়েননি। বর্ণনার বাহ্যিক দিক থেকে যেমনিভাবে বুঝা যায়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ঐ সময় রাসূলে করিম (সাঃ)-এর ঘোষণা শুনেছিলেন। এ জন্য ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর কাজের ব্যাপারে বললেন, 'তিনি সুন্নাতের উপরে আমল করেছেন।' অর্থাৎ এ হুকুমের উপর আমল করছেন যা আমি রাসূলে করিম (সাঃ) থেকে শুনেছি 'যে চায় সে জুমআর নামায পড়তে পারে।'

(বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড – ২, পৃঃ –১৭৩)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটু একনিষ্ঠ মনে লক্ষ্য করুন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) কোন সাহাবী, তাবেয়ী বা তাব-এ-তাবেয়ীও নন। বরং উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিজ্ঞ আলিম মাত্র। অথচ হযরত যায়েদ বিন আরকম, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর উপর তানকীদ করে তাঁদের মতামত প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু গাংগুহী সাহেবই নন বরং কেউই তাঁদের মতকে গ্রহণ করেননি।

যদি সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক হতেন এবং সকল প্রকার তানকীদ বা যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে হতেন, তাহলে হযরত গাংগুহী সাহেবও অন্যান্যদের উল্লেখিত তিন সাহাবীর মতামত প্রত্যাখ্যান ও তাঁদের উপর তানকীদ করা কি জায়েয হত? যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে মিয়ারে হক এবং সকল প্রকার যাচাই-বাছাইয়ের উর্ধ্বে মনে করেন এবং এর উল্টো মত পোষণকারীদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নন বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তারা কি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নন বলে ফতোয়া দিতে পারবেন?

যদি না পারেন তাহলে শুধুমাত্র মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এবং জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্দে কোন ঈর্ষায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা এ ধরনের ঢালাও ফতোয়া দিচ্ছেন? আপনারাই বিচার করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সাহাবায়ে কিরামের উপর তানকীদের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সবগুলো উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয় বিধায় কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর আকিদা

صحابہ کرام کے متعلق میرا عقیدہ بھی وهی هے جو عام محدثین وفقہاء اور علماء امت کا عقیدہ هے کہ "کلهم عدول" ظاهر هے کہ هم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ وهی هیں - اگرانکی عدالت میں ذرہ برابر بهی شبہ پیدا ہوجائے تودین بهی مشتبہ هوجاتا هے - لیکن میں " الصحابة کلهم عدول "(صحابہ سب راستباز هیں) کا مطلب یہ نهیں لیتاکہ تمام صحابہ بے خطاتهے

اوران میں کا ہرایك ہرقسم کے بشری کمزوریوں سے بالاترتھے۔ اور از میں سے کسی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ھے۔ بلکہ میں اس کا مطاب یہ لیتاھوں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کرنے، یاآپ کیطرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے کبھی راستی سے ہرگزتجاوز نہیں کیا ھے -
(خلافت وملوکیت)

সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে আমার আকীদা তাই যা মুহাদ্দিসীনে কেরাম, ফুকাহা ও ওলামায়ে কেরামদের আকিদা যে, 'তাঁরা সবাই সত্যবাদী।' আমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম তাঁরাই। তাঁদের সত্যবাদীতায় যদি সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে সমস্ত দ্বীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি "الصحابة كلهم عدول" (তাঁরা সবাই সত্যবাদী) এর অর্থ এটা গ্রহণ করি না যে, সমস্ত সাহাবা নিষ্পাপ ছিলেন এবং তাঁরা সকল প্রকার মানসিক দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কোন সময় কোন ভুল করেননি। বরং আমি এর অর্থ এটা নেই যে, রাসূলে করিম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করার বেলায় কিংবা রাসূলে করিম (সঃ) এর সাথে কোন কথা যুক্ত করার বেলায় তাঁরা সম্পূর্ণ عادل বা সত্য। [খেলাফত ও রাজতন্ত্র]

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) - এর দৃষ্টিতে তানকীদের সঠিক পদ্ধতি

تمام بزرگاں دین کے معاملہ میں عموما اور صحابہ کرام کے معاملہ میں خصوصاً میراطرز عمل یہ ھے کہ جہاں تك کسی معقول تاویل سے یاکسی معتبر روایت کی مددسے انکے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو، اسی کو اختیار کیا جائے اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تك نہ کی جائے جب تك اسکے سوا چارہ نہ رھے - لیکن دوسری طرف میرے نزدیك معقول تاویل کی حدوں سے تجاوزکرکے اور لیپ پوت کرکے غلطی کو چھپانا

یاغلط کوصحیح بنانیکی کوشش کرنا نہ صرف انصاف اور علمی تحقیق کے خلاف ھے، بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا موں، کیونکہ اسطرح کی کمزور وکالت کسی کومطمئن نہیں کرسکتی اوراسکا نتیجہ ھوتا ھے کہ صحابہ اور دوسرے بزرگوں کے اصلی خوبیوں کےبارے میں جوکچھ کہتے ھیں وہ بھی مشکوك ھوجاتا ہے - اس لئے جہاں صاف صاف دن کی روشنی میں ایك چیز علانیہ غلط نظرآرھی ھو، وھاں بات بنانے نے کے بجا ئے میرے نزدیك سیدھی طرح یہ کہنا چا ہئیے کہ فلاں بزرگ کایہ قول یا فعل غلط تھا، غلطیاں بڑے سے بڑے انسانون سے بھی ھوجاتی ھیں اوران سے انکی بڑائی میںکوئی فرق نہیں آتا کیونکہ انکامرتبہ ان کے عظیم کاموں کی بناپر متعین ھو جاتاھے نہ کہ ان کی کسی ایك یادو چار غلطیوں کی بنابر - (خلافت وملوکیت)

সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে সাধারণভাবে এবং সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে বিশেষভাবে আমার নীতি হল এই, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন যুক্তিসঙ্গত তাবীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা তাঁদের কোন কথা বা কাজের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে গ্রহণ করা। এবং এটাকে ভুল প্রমাণিত করার সাহস ততক্ষণ পর্যন্ত না করা যখন এটাকে ভুল বলা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু অন্যদিকে আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার সীমালংঘন করে ধামাচাপা দিয়ে ভুলকে লুকানো কিংবা ভুলকে সঠিক বানানোর চেষ্টা করা শুধুমাত্র ইনসাফ এবং সঠিক জ্ঞানেরই বিরোধী নয়, বরং আমি এটাকে ক্ষতিকরও মনে করি। কেননা এ ধরনের দুর্বল ওকালতি কাউকে সন্তুষ্টিদান করতে পারে না। এবং এর ফল এই যে, সাহাবা এবং অন্যান্য বুজুর্গানের আসল সৌন্দর্য এবং গুণাগুণের ব্যাপারে আমরা যা বলে থাকি তা-ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য যেখানে একটা জিনিস দিবালোকের মত পরিষ্কার ভুল দেখা যাচ্ছে, সেখানে কথা বানানোর পরিবর্তে আমার নিকট সোজা এ কথা বলে দেয়াই ভাল যে, অমুক বুজুর্গের এই কথা কিংবা কাজ ভুল ছিল। ভুল তো অনেক সময় বড় বড় মানুষেরও হয়ে যায়। কিন্তু এতে তাদের বড়ত্বের মধ্যে কোন কম-বেশী হয় না। কেননা তাঁদের মর্যাদা তাঁদের মহান কাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

[খেলাফত ও রাজতন্ত্র]

مسئله وقت السحور فی رمضان

রমজানে সেহরীর সময়ের মাসআলা

এটি এমন একটি মাসআলা যেটা দ্বারা মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ মানুষকে অতি তাড়াতাড়ি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন এবং মাওলানাকে নির্বিঘ্নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বের করে দেয়। কিন্তু কোরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মাওলানা এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিরোধী কোন নতুন কথা নয়, বরং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ী, তাব-এ তাবেয়ী, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং সালফে সালেহীন যা বলেছেন মাওলানা তাই বলেছেন। মাওলানা এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কোরআনে সূরায়ে বাকারার ১৮৭নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ

آج کل لوگ سحری اور افطارکے معاملہ میں شدت احتیاط کی بناپر کچھ تشدد برتنے لگے ھیں - مگرشریعت نے ان دونوں کی اوقات کی کوئی ایسی حدبندی نہیں کی ھے جس سے چند سکینا یا چند منٹ إدہرأدہر ھوجانے سے آدمی کا روزہ خراب ھوجاتاھو - سحری میں سیاھی شب سے سپیدہ صبح کا نمودار ھونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتاھے - اور ایك شخض کیلئیے یہ بالکل صحیح ھے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اسکی آنکہ کھلی ھو، تووہ جلدی سے اٹھکر کچھ کھاپی لے، حدیث میں آتاھے کہ حضور صلعم نے فرمایاہے "اگرتم میں سے کوئی شخص سحری کھارہاھو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑ نہ دیے - بلہ اپنے حاجت بھر کھاپی لے" . اسی طرح افطارکے وقت میں غروب آفتاب کے بعد خواہ

مخواہ دنکی روشنی ختم ہونے تك انتظار کرتے رہنا کوئی ضروری امر نہیں - نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال (رض) کوآوازدیتے تھے کہ لاوہمارا شربت - بلال (رض) عرض کرتے یارسول اللہ، ابھی تودن چمك رہاہے - اپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے آنھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے -

বর্তমানে কোন কোন লোক সেহেরী ও ইফতার সম্পর্কে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ও মাত্রাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এ দু'টি সময়ের সীমা এমনভাবে বেঁধে দেয় নাই যে, কয়েক সেকেন্ড কিংবা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হলেই রোজা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শেষ রাত্রে 'রাত্রির কালিমা হতে সুবহে সাদিক ফুটে উঠার' কথায় যথেষ্ট বিশালতা ও প্রশস্ততা রয়েছে এবং ঠিক সুবহে সাদিক উদয়ের সময় কারো নিদ্রা ভঙ্গ হলে তাড়াতাড়ি কিছু খানাপিনা করে নেওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন— তোমরা সেহরী খাওয়ার সময় যদি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও, তবে সহসা খানা ত্যাগ করবে না। বরং প্রয়োজন পরিমাণে খানা-পিনা খেয়ে নিবে। ইফতারের সময়ও অনুরূপভাবে সূর্যাস্তের পরও শুধু শুধু দিনের জ্যোতি শেষ হওয়ার অপেক্ষা করার কোন আবশ্যকতা নেই।'

নবী করিম (সাঃ) সূর্যাস্তের সংগে সংগে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বলতেন– 'আমার শরবত নিয়ে আস।'

বেলাল বলতেন– 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখনও তো দিন জ্বলজ্বল করছে!'

উত্তরে নবী করিম (সাঃ) বলতেন– 'পূর্ব দিক হতে রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে রোজা শেষ হয়ে যায়।'

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা মাওলানার কথাটি কোরআন ও হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাব-এ তাবেয়ী, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে কেরামদের কথা ও কাজের সাথে মিলিয়ে দেখি, সত্যিই কি মাওলানার কথা কোরআন শরীফের হুকুমের বিরোধী এবং সত্যিই কি তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভুত?

তবে এ আলোচনার আগে একটি কথা পরিষ্কার করে নিলে ভাল হয় যে, সেহরীর শেষ সময় সীমা নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামায়াত এবং অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে সুবহে সাদিক আরম্ভ

হওয়ার সময় যখন আলো এখনও বিস্তার লাভ করে নাই, খাওয়া-দাওয়া জায়েয আছে। ফতোয়ায়ে আলমগীর ১ম খণ্ডে বলা হয়েছে ঃ واليه مال اكثر العلماء এবং এটাই অধিকাংশ ওলামাদের মত। [দেখুন পৃষ্ঠা নং ২০৬]

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- এর আছার (কথা ও কাজ)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ)-বুখারী শরীফের শরাহে ফতহুল বারী ৪র্থ খণ্ডে ফুকাহা এবং সালফে সালিহীনদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নিম্নলিখিত আছার (কথা ও কাজ) উল্লেখ করেন ঃ

وذهب جماعة من الصحابة وقال به الاعمش من التابعين وصاحبه ابوبكر عياش الى جوازالسحورالى ان يتضح الفجر -

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এক জামায়াত এবং তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে আমশ এবং তাঁর ছাত্র আবু বকর বিন আইয়াশের অভিমত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক একেবারে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেহরী জায়েয আছে। [ফতহুল বারী]

فروى سعيد بن منصور عن الى الاحوص عن عاصم عن زر عن حذيقه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهارغيران الشمس لم تطلع واخرجه الطحاوى من وجه اخر عن عاصم نحوه -

সায়ীদ বিন মানসুর তাঁহার সনদসহ হযরত হোজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম! আমরা রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সাথে দিনেই সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সেহরী খেয়েছিলাম।

ইমাম তাহাবীও অন্যভাবে আসীম থেকে বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী]

وروى ابن ابى شيبة وعبد الرزاق ذلك عن ابى حذيفة من طرق صحيحة -

ইবনে আবি শাইবা এবং আবদুর রাজ্জাক এ হাদীস হযরত হোযাইফা থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [ফতহুল বারী]

وروای سعید بن منصور وابن ابی شیبة وابن المنذر من طریق صحیح عن ابی بکر انه امر بغلق الباب حتی لایری الفجر -

সায়ীদ বিন মানসুর, ইবনে আবি শাইবা এবং ইবনে মুনজির হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) দরজা বন্ধ করার আদেশ দেন, যাতে সুবহে সাদেকের আলো না দেখতে পান। [ফতহুল বারী]

ورویٔ ابن المنذرباسنادصحیح عن علی رضـ انه صلی الصبح ثم قال الان حین یبین الخیط الابیض من الخیط الاسود-

ইবনে মুনজির সঠিক সনদ সহকারে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) একদা ফজরের নামায পড়ে বললেন, এখন রাত্রির কালিমা হতে ফজরের আলোকচ্ছাটা ফুটে উঠার সময় হয়েছে।

[ফতহুল বারী]

قال ابن المنذر وذهب بعضهم الی ان المراد تبین بیاض النهار من سواد اللیل ان ینتشر البیاض فی الطرق والسكك والبیوت ثم حکی ما تقدم عن ابی بکر وغیره -

ইবনে মুনযির বলেন, কোন কোন ওলামার মাজহাব হল এই যে, রাত্রির কালিমা হতে ফজরের আলোকচ্ছাটা ফুটে উঠার অর্থ হল দিনের আলো রাস্তা, গলি এবং ঘরের মধ্যে ভালভাবে বিস্তার লাভ করা, এবং এর উপর দলিল হিসেবে ইবনে মুনজির (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাদের উল্লেখিত আছারগুলো বর্ণনা করেন। [ফতহুল বারী]

وروی باسنادصحیح عن سالم بن عبید الا شجعي وله صحبة ان ابا بکر قال له اخرج فانظر فهل طلع الفجر قال فنظرت ثم اتیته فقلت قد ابیض وسطع ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فنظرت فقلت قد اعترض فقا لان ابلغ شرابی -

ইবনে মুনজির সঠিক সনদসহ হযরত সালিম বিন উবাইদ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে বললেন, বাইরে যাও এবং দেখ সুবহে সাদেক হয়েছে কি না?

হযরত সালিম বিন উবাইদ বলেন, আমি গেলাম এবং ফিরে এসে বললাম, সুবেহ সাদেক খুব পরিষ্কারভাবে হয়েছে।

তিনি পুনরায় বললেন, যাও এবং দেখ সুবহে সাদেক হয়েছে কি না?

আমি গেলাম এবং ফিরে এসে বললাম, আলো বিস্তার লাভ করেছে।

তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, নিয়ে এস আমার শরবত।

[ফতহুল বারী]

روى من طريق وكيع عن الاعمش انه قال لو لا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت

হযরত আমশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যদি খাওয়ার ইচ্ছা না থাকত তাহলে ফজরের নামায পড়ে সেহেরী খেতাম। [ফতহুল বারী]

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেন ঃ

"قلت وفى هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الاجماع على خلاف ما ذهب اليه الاعمش" -

আমি বলি, সাহাবায়ে কিরামের ঐ সমস্ত আছার এবং তাবয়ীনদের কথা দ্বারা ঐ সমস্ত ওলামাদের দাবীর জওয়াব হয়ে যায় যারা বলেন যে, আমশের মাযহাবের খেলাফ অর্থাৎ সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর সেহরী খাওয়া নাজায়েয হওয়ার উপর ইজমা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ইমাম ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত

قال اسحق هؤلاء رأواجواز الاكل بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل - قالاسحق وبالقول الاول اقول ولكن لااطعن على من تأول الرخصت كالقول الثانى ولا ارى عليه قضاء ولا كفارة - (فتح البارى رح صـ٤)

ইমাম ইসহাক বলেন, যারা সুবহে সাদিক হওয়ার পর আলো বিস্তার লাভ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া জায়েয মনে করেন, আমি তাদেরকে কোন প্রকার মন্দ বলি না এবং তাদের উপর কাজা কিংবা কাফ্‌ফারা ওয়াজিব বলেও মনে করি না।

আহনাফ (রহঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ووقته من حين يطلع الفجر الثانى وهو المستطير المنتشرفى الافق الى غروب الشمس وقداختلف فى ان العبرة لاول طلوع الفجر الثانى او لا ستطارته وانتشاره - فيه اختلاف قال شمس الائمة الحلوانى فى القول الاول احوط والثانى اوسع هكذا فى المحيط واليه مال اكثرالعلماء كذا فى خزانة الفتواى - (فتاوى علمگيرى ج اص ٢٠٦)

রোজার সময় সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে। হ্যাঁ, ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধ হল এ কথায় যে, রোজার সময় ফজর উদিত হওয়া থেকেই, না আলো বিস্তার লাভ করা থেকে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেন, প্রথম কথায় সতর্কতা ও দ্বিতীয় কথায় প্রশস্ততা। এমনিভাবে 'মুহিত'ও উল্লেখ করেছেন। খাজানাতুল ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় কথার প্রতি অধিকাংশ ওলামাদের মত রয়েছে।

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা

আল্লামা শামী 'দুররুল মুখতার' দ্বিতীয় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় শরীয়ত সমর্থিত রোজার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

هو امساك المفطرات فى وقته وهو اليوم -

শরীয়ত সমর্থিত রোজা হল, রোজার সময়ে ঐ সমস্ত জিনিস থেকে দূরে সরে থাকা যেগুলো রোজা ভঙ্গকারী। আর রোজার সময় হল يوم বা দিন।

আল্লামা শামী اليوم। শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

اى اليوم الشرعى من طلوع الفجر الى الغروب وهل المراد اول زمان الطلوع اوانتشار الضوء؟ فيه خلاف - والاول احوط والثانى اوسع كما قال الحلوانى كما فى الحيط -

অর্থাৎ, শরীয়ত সমর্থিত দিন হল ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। হ্যাঁ, এ কথার মধ্যে বিরোধ রয়েছে যে, ফজর উদিত হওয়ার অর্থ সূর্য উদিত হওয়ার মুহূর্ত না আলো বিস্তার লাভ হওয়ার সময়। প্রথম কথায় সতর্কতা এবং দ্বিতীয় কথায় সাধারণ মানুষের জন্য প্রশস্ততা। [শামী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ -১১০]

ইমাম আকমলুদ্দিন মোহাম্মদ বিন মাহমুদ হানাফী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আকমলুদ্দিন মোহাম্মদ বিন মাহমুদ হানাফী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এনায়া শারহে হেদায়ার' দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ

ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانی قيل العبره لاول هو وقيل لانتشاره واستنارته ـ قال شمس الائمة الحلوا نی الاول احوط والثانی ارفق -

রোজার সময় সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ হয়। কেউ কেউ বলেন, সুবহে সাদেক আরম্ভ হওয়ার প্রারম্ভিক সময় ধর্তব্য, আর কেউ কেউ বলেন আলো বিস্তার লাভ হওয়ার সময় ধর্তব্য। শামসুল আইম্মিয়া হালওয়ানী বলেন, প্রথম কথায় সতর্কতা এবং দ্বিতীয় কথায় প্রশস্ততা।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা

মুল্লা আলী ক্বারীর শরহে নেকায়া প্রথম খণ্ডে ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ

والمعتبراول طلوع الفجرعند الجمهوروقيل استنارته وهومروی عن عثمان رضـ وحذيفة وطلق بن علی وعطاء بن رباح والاعمش وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم وانما كانوا يعدون الفجرالذی علی البيوت ـ

অধিকাংশ ওলামারা বলেন, ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময়ই ধর্তব্য। আর কেউ কেউ বলেন, আলো ভালভাবে বিস্তার লাভ করা ও উজ্জ্বল হওয়া ধর্তব্য। এই শেষ কথাটিই হযরত উসমান, হোজাইফা এবং তালাক বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে আতা বিন রেবাহ এবং আমশ-এর মাযহাব এটিই।

মাসরুক বলেন, সাহাবায়ে কেরামদের নিকট আপনাদের ফযর ধর্তব্য ছিল না, বরং তাঁদের কাছে ঐ ফজর ধর্তব্য ছিল যা ঘর এবং ছাদের উপর উজ্জ্বল হয়ে বিস্তার লাভ করত।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর অভিমত

وبما يشير اليه قوله تعالى "حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود "الى ان المرادهو التبين دون نفس انبلاج الفجر وهواولى بحال العوام نظرا الى تيسير الشرع فان اكثر الخواص ايضاعاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير الخواص فاناطة الامر بنفس الانبلاج لا يخلو عن احراج وتكليف - (بذل المجهود ج ٣ ص ٤٠)

কোরআন শরীফের আয়াত يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى এর ইঙ্গিত দিয়ে কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এ মাযহাব স্থির করেছেন যে, تبين শব্দের অর্থ শুধুমাত্র ফজর উদিত হওয়া নয়, বরং আলো ভালোভাবে বিস্তার লাভ করা অর্থাৎ রোজাদার ব্যক্তির জন্য আলো বিস্তার লাভ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া জায়েয। এ মাযহাব শরীয়তের আইনের সুযোগ ও সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের বেলায় বেশী প্রযোজ্য। কেননা ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময় সম্পর্কে অবগত হতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনেক সময় ব্যর্থ হন আর সাধারণ মানুষ কি করে অবগত হবে? সুতরাং খাওয়া-দাওয়া জায়েয এবং নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে যদি ফজর উদিত হওয়ার প্রারম্ভিক সময়ের সাথে হয়, তাহলে তা অসুবিধা ও কষ্টদায়ক।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উল্লেখিত আলোচনা থেকে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাওলানা মওদুদী (রহঃ) সেহেরী সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিরোধী নয় এবং তিনি কোরআন শরীফ পরিবর্তনকারীও নন। বরং তাঁর সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত উসমান (রাঃ)-এর মত সাহাবায়ে কেরামদের এক জামায়াত, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং ওলামায়ে কেরামদের এক বিরাট দল রয়েছেন।

মাওলানার প্রতিপক্ষরা তাঁর উপর যে ফতোয়া দিয়েছেন সে ফতোয়া অনুসারে ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ওলামায়ে কেরামও তাদের ফতোয়ার আওতায় পড়ে যান। আশা করি কোন মুসলমান-ই তা স্বীকার করবেন না। বরং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে ওরা সাহাবায়ে কেরামদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বের করে দিল। (নাউজুবিল্লাহ!) আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত করুন।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ)

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা মাওলানা মওদূদী (রহঃ) –এর প্রতিপক্ষের একটা বড় হাতিয়ার। যেটার সূত্র ধরে তারা মাওলানাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বহির্ভুত হওয়ার ফতোয়া দিয়েছে। মাওলানা সূরা ইউনুসের ৯৮ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ

قرآن میں اس قصہ کیطرف تین جگہ صرف اشارات کئے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دیگی ہے اسلئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم کن خاص وجوہ کی بنا پرخداکے اس قانون سے مشتثنی کی گئی - عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اسکے لئے نافع نہیں ہو سکتا - تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس (ع) کی تفصیلات پر غورکرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے، کہ حضرت یونس (ع) سے فریضہ رسالت کی اد ئیگی مین کچھ کوتاہیاں ہوگئی تھیں اور غالبا انہوں نے بے صبر ہوکرقبل ازوقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیاتھا - اسلئے اشوریوں نے آثارغذاب دیکھکر توبہ واستغفار کی "توالله تعالی نے انہیں معاف کردیا - قران کریم میں خدائی دستور کے جو اصول کلیات بیان کئے گئے ہیں - ان میں ایگ مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ الله تعالی کسی قوم کواس وقت عذاب نہیں دیتا جب تك اس پراپنی حجت پوری نہیں کر لیتا - پس جب نبی سے ادائے رسالت میں کوتاهی ہوگئی اورالله کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطورخود اپنی

جگہ سے ہٹ گئے تو اللہ تعالی کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا - کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں - (تفہیم القران ج ۲ ص ۳۱۲)

অর্থাৎ কোরআন শরীফে তিনটি জায়গায় এ ঘটনার প্রতি শুধু ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোথাও কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয় নাই। এ কারণে কোন কওম সম্পর্কে আযাব দানের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনায় কোনই ফায়দা হয় না। খোদার এই নিরপেক্ষ ও অটল নিয়মের ব্যতিক্রম করে এবং কোন্ বিশেষ কারণে এ জাতিকে সিদ্ধান্ত করা আযাব হতে মুক্তি দেয়া হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তথাপি কোরআন শরীফের ইঙ্গিত ও ছহীফায়ে ইউনুসের বিস্তারিত বিবরণ থেকে এতটুকু জানা যায় যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল, এবং খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বে অধৈর্য হয়ে তিনি তাঁর স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এ কারণে আযাবের পূর্বাভাস দেখতে পেয়ে অসুরীয় লোকেরা যখন তওবা করল এবং খোদার নিকট গুনাহের ক্ষমা চাইল তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

কোরআন মজীদে খোদার যেসব নিয়ম-নীতি উল্লেখিত হয়েছে তন্মধ্যে একটি বিশেষ স্থায়ী নীতি এই যে, কোন জাতির লোকদের সামনে সত্য দ্বীন যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ – দলিল প্রমাণ সহকারে তুলে ধরা না হবে ততক্ষণ তিনি কারো উপর আযাব নাযিল করেন না। যখন নবী থেকে রিসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজে নিজেই আপন জায়গা থেকে চলে গেলেন তখন আল্লাহর ইনসাফ এ জাতির উপর আযাব দেয়া পছন্দ করল না। কেননা তাদের সামনে সত্য দ্বীনের উপস্থাপনের আইনগত শর্তসমূহ সম্পূর্ণ হয় নাই। [তাফহীমুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃঃ – ৩১২]

মাওলানার উল্লেখিত বক্তব্য থেকে যে তিনটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল।

২) আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত সময় আসার পূর্বে তিনি অধৈর্য হয়ে নিজের স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

৩) তিনি তাঁর জাতির উপর اتمام حجت বা সত্য দ্বীনের উপস্থাপনের আইনগত শর্তসমূহ পূর্ণ করেন নাই।

এ তিনটি কথার উপর কোন কোন ওলামায়ে কেরাম অভিযোগ করে বলেছেন, মওদূদী সাহেবের কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা মাওলানার কথাগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের মতের সাথে মিলিয়ে দেখি, সত্যিই কি তা আপত্তিকর?

মাওলানার কথাগুলির উপর যখন আপত্তি ওঠে তখন তিনি নিজেই তাফহীমুল কোরআনো সূরা আছ-ছাফফাতের ৮৫ নং টিকায় এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন ঃ

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার তাফসীরে আমরা যা কিছু লিখেছি সে সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন। এ কারণে অপরাপর তাফসীরকারকদের উক্তিকে এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

বিখ্যাত মুফাসসীর কাতাদা (রাঃ)-এর উক্তি

مشہور مفسر قتادہ (رضـ) سورہ یونس آیتة ۹۸کی تفسیرمین
فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں گزری ھے جوکفرکر چکی ھو
اور عذاب آجانیکے بعد ایمان لائی مو اور پھر اسے چھوڑ دیاگیاہو
- اس سے صرف قوم یونس مستثنی ھے - انہوں نے جب اپنے نبی
کوتلاش کیا اورنہ پایا، اور محسوس کیا کہ عذاب قریب آگیا ھے
تو اللہ نے انکے دلوں میں توبہ ڈال دی - (ابن کثیر ج ۲ ص ٤۳۳)

প্রখ্যাত মুফাসসীর কাতাদাহ (রাঃ) সূরা ইউনুসের ৯৮নং আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এমন কোন জনবসতি নেই যারা কুফরী করেছে ও আযাব আসার পর ঈমান এনেছে, আর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এ থেকে একমাত্র ইউনুস (আঃ)-এর জাতি রক্ষা পেয়েছে। তারা যখন তাদের নবীকে সন্ধান করে পেল না এবং অনুভব করল যে, আযাব আসন্ন হয়ে এসেছে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরে তওবা জাগিয়ে দিলেন। [ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ৪৩৩]

اسی آیت کی تفسیرمیں علامہ آلوسی (رح) لکھتے ہیں" اس قوم کا قصہ یہ ھے کہ یونس علیہ السلام موصل کے علاقے میں نینوی کے لوگوں کیطرف بھیجے گئے تھے - یہ کافرومشرك لوگ تھے - یونس ع نے انکو اللہ وحدہ لاشریك پر ایمان لانے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دینے کی دعوت دی، انہوں نے انکارکیا ء جھٹلایا - حضرت یونس علیہ السلام نے انکو خبردی کہ تیسرے دن ان پر عذاب آجائیگا - اورتیسرے دن آنے سے پہلےآدھی رات کووہ بستی سے نکل گئے پھردن کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا - اور انہیں یقین ھو گیا کہ سب ہلاك ہوجائینگے توانہوں نے اپنے نبی کوتلاش کیا - مگر نہ پاپا - آخرکاروہ اپنے بال بچوں اور جانوروں کولیکر صحرا میں نکل آئے اور ایمان وتوبہ کا اظہار کیا - پس اللہ تعالی نے ان پر رحم کیا اور انکی دعا قبول کرلی -

(روح المعانی ج ۱۱ط ۱۷۰)

আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এ জাতির কাহিনী এই যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মুছেল এলাকার নি-নাওয়ার লোকদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ছিল কাফের ও মুশরিক লোক।

হযরত ইউনুস (আঃ) তাদেরকে এক লা শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারা সে দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল ও তাঁকে অমান্য করল। হযরত ইউনুস (আঃ) তাদেরকে বললেন, তৃতীয় দিন তাদের উপর আযাব আসবে।

আর তৃতীয় দিন আসার আগেই অর্ধেক রাত্রিতে তিনি বস্তি হতে বের হয়ে চলে গেলেন।

পরে দিনের বেলা যখন এ জাতির উপর আযাব এসে উপস্থিত হল ও তারা নিশ্চিতই বুঝল যে, সকলকেই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে তখন তারা নবীকে তালাশ করল। কিন্তু তাঁকে আর পেল না। শেষ পর্যন্ত তারা সকলে নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও জন্তু-জানোয়ার নিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে এল এবং ঈমান আনয়ন ও তওবা প্রকাশ করল। এতে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করলেন এবং দোয়া কবুল করলেন [রুহুল মায়ানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭০]

سورہ انبیاء آیت ۸۷ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی (رح) لکھتے ہیں" حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہوکر نکل جانا ہجرت کا فعل تھا، مگر انہیں اس حکم نہیں دیا گیاتھا" - (روح المعانی ج ۱۱ص ۱۷۰)

پھر وہ حضرت یونس کی دعاکے فقرہ "انی کنت من الظالمین" کامطلب یوں بیان کرتے ہیں یعنی مین قصوروارتھا کہ انبیاء کے طریقہ کے خلاف حکم آنے سے پہلے ہجرت کرنے میں جلدی کربیٹھا - یہ حضرت یونس علیہ السلام کیطرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور توبہ کا اظہار تھا - تاکہ اللہ تعالی انکی اس مصیبت کودور فرمادے - (روح المعانی ج ۱۷ ص ۷۸)

সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লামা আলুসী লিখেছেন ঃ

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নিজের জাতির লোকদের প্রতি নারাজ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছিল একটা হিজরত। কিন্তু এ হিজরত করার জন্য তাঁকে হুকুম দেয়া হয় নাই।

[রুহুল মায়ানী, ১৭শ খণ্ড, ৭৭ পৃঃ]

পরে তিনি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দোআ " انی کنت من الظالمین "-এর অর্থ বলেছেন এভাবে ঃ

আমি অপরাধী ছিলাম, নবীদের রীতির বিপরীত নির্দেশ আসার আগে হিজরত করার ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করেছি।

এটা ছিল হযরত ইউনুস (আঃ)-এর গুনাহের স্বীকারোক্তি ও তওবাকরণ। উদ্দেশ্যে আল্লাহ যেনো তার এ বিপদ দূর করে দেন।

[রুহুল মায়ানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ – ৭৮]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) সাহেবের উক্তি

مولانا اشرف علی تھانوی (رح) کا حاشیہ اس آیت پر یہ ھے کہ وہ اپنی قوم پر جبکہ وہ ایمان نہ لائی، خفاھوکر چل دیئی اور قوم پر سے عذاب ٹل جانے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لئے ہمارے حکم کاانتظار نہ کیا - (بیان القرآن)

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব এ আয়াতের টিকায় বলেন, তিনি তাঁর জাতির উপর–যখন তারা ঈমান আনল না–রাগ করে চলে গেলেন। আর জাতির উপর হতে আযাব টলিয়ে যাওয়ার পরও তিনি নিজে ফিরে আসলেন না আর এ সফরের জন্য আল্লাহর নির্দেশ অপেক্ষা করলেন না। [বয়ানুল কোরআন]

মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ)-এর উক্তি

اسی آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی (رحـ) حاشیہ میں فرماتے ہیں" قوم کی حرکات سے خفا ھوکر غصے میں بھرے ھوئے شھر سے نکل گئے ، حکم الٰھی کا انتظار نہ کیا، اوروہ وعدہ کرگئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئیگا - انی کنت من الظالمین" اپنی خطاکا اعتراف کیا کہ بیشك میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کئے بغیر بستی والوں کو چھوڑکر کر نکل کھڑا ھوا -

মাওলানা শাব্বির আহম্মদ ওসমানী (রহঃ) এ আয়াতের টিকায় লিখেছেন ঃ

জাতির গতিবিধি ও চালচলনে রাগান্বিত হয়ে শহর হতে বেরিয়ে গেলেন, আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করলেন না। আর ওয়াদা করে গেলেন যে, তিন দিন পর তোমাদের উপর আযাব আসবে। انی کنت من الظالمین বলে নিজের ভুল স্বীকার করে বলেন, আমি খুব তাড়াহুড়া করেছি সন্দেহ নেই, তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই বস্তির লোকদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছি।

ইমাম রাযী (রহঃ)-এর উক্তি

سورہ صافلت کی آیات بالاکی تشریح میں امام رازی (رحـ) لکھتے ہیں "حضرت یونس علیہ السلام کا قصور یہ تھا کہ اللہ تعالی نے انکی اس قوم کوجس نے انہیں جھٹلا یاتھا ھلاك کرنیکا وعدہ فرمایا، یہ سمجھے کہ عذاب لا محالہ نازل ھونیو الاھے اس لئے انہوں نے صبرنہ کیا اورقوم کو دعوت دینے کا کام چھوڑ کرنکل گئے حالانکہ ان پر واجب تھا کہ دعوت کاکام برابر جاری رکھتے، کیونکہ اس امرکا امکان باقی تھا کہ اللہ ان لوگوں کوہلاك نہ کرے - (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۱۵۸)

সূরা আছ-ছাফফাত-এর পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অপরাধ ছিল যে, যে জাতি তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্ তায়ালা সে জাতিকে ধ্বংস করার ওয়াদা করেছিলেন। এতে তিনি বুঝেছিলেন যে, এ আযাব অবশ্যই নাযিল হবে। এ জন্য তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন না এবং জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কাজ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অথচ দাওয়াত দেয়ার কাজ অব্যাহতভাবে জারি রাখাই তাঁর উপর ওয়াজিব ছিল। কেননা এ সম্ভাবনা ছিল যে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন না।

[তাফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ – ১৫৮]

আল্লামা আলুসী (রহঃ)-এর উক্তি

علامه آلوسی (رح) "اذابق الی الفلك المشحون" - پر لکھتے ہیں "ابق" کے اصل معنی آقاسےفرار ہونے کے ہیں - چونکہ حضرت یونس (ع) اپنے رب کے اذن کے بغیر اپنی قوم سے بھاگ نکلے تھے اسلئے اس لفظ کا اطلاق ان پر درست ہوا" پھرآگے چل کر لکھتے ہیں ، جب تیسرا دن ھوا تو حضرت یونس (ع) اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل گئے - اب جب انکی قوم نے ان کو نہ پایا تووہ اپنے بڑے اور چھوٹے اور جانوروں سب کولیکر نکلے - اور نزول عذاب ان سے قریب تھا پس انہوں نے اللہ تعالی کے حضور زاری کی اور معافی مانگی اوراللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا -

(روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۳۰)

আল্লামা আলুসী (রহঃ) "اذ ابق الی الفلك المشحون" সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ابق" শব্দের আসল অর্থ হল মনিবের নিকট হতে গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আঃ) যেহেতু আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত নিজ জাতির নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এ কারণে তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয়েছে।

একটু পরে আবার লিখেছেন ঃ

তৃতীয় দিন যখন আসল তখন হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীতই চলে গেলেন। পরে তাঁর জাতি যখন তাঁকে পেল না তখন তারা ছোট-বড় সব লোক ও সব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বের হল। আযাব নাযিল হওয়ার আর দেরী ছিল না। তারা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করল ও ক্ষমা চাইল। আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিলেন।

(রুহুল মায়ানী, ২৩শ খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)

মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র:)-এর উক্তি

مولانا شبیر احمد صاحب (رح) "وھو ملیم" کی تشریح کر تے ھوے فرماتےھیں : الزام یہی تھا که خطائے اجتھادی سے حکم الہی کا انتظارکئے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کردی -

মাওলানা শাবীর আহমদ সাহেব "وھو ملیم" -এর ব্যাখা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

অভিযোগ এই ছিল যে, ইজতেহাদী ভুল করে আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা না করেই বস্তি হতে বেরিয়ে গেলেন এবং আযাব নাযিল হওয়ার দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন।

پھرسورہ القلم کی آیت "فاصبر لحکم ربك ولا تکن کصاحب الحوت" پر مولنا شبیراحمد(رح) کا حاشیه یه ھے : یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانیوالے پیغمبر (حضرت یونس علیه السلام) کیطرح مکذبین کے معامله میں تنگدلی ذور گھبراھٹ کا اظھار نه کیجیئے -اوراسی ایت کے فقرہ " وھو مکظوم" کا حاشیه تحریر کرتے ھوتے مولانا فرما تے ھیں" یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ھوئے تھے جھنجلا کرشتابی عذاب کادعا، بلکه پیش گوئی کر بیٹھے -

সূরা আল-কালামের আয়াত "فاصبر لحکم ربك ولا تکن کصاحب الحوت" সম্পর্কে মাওলনা শাব্বীর আহমদ সাহেবের লিখিত টিকা হলো ঃ

অর্থাৎ মাছের পেটে গমনকারী পয়গাম্বর (হযরত ইউনুস)-এর মত অমান্যকারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণমনা ও ঘাবড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা প্রকাশ কর না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যাংশ " وھو مکظوم" -এর টিকায় লিখেছেন ঃ

অর্থাৎ জাতির প্রতি ক্রোধে তিনি ভরপুর ছিলেন। ক্রোধে অস্থির হয়ে শীঘ্র আযাব নাযিল হওয়ার দো'আ এবং ভবিষ্যৎবাণী করে বসলেন।

(তাফহীমুল কোরআন, সূরা আস-সাফফাত, টিকা-৮৫)

হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হাদিসে রাসূল (সাঃ)

وروى محمد بن اسحق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة قال سمعت ابا هريرة رضـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الله حبس يونس فى بطن الحوت اوحى الله الى الحوت ان خذه ولا تخد شى له لحما ولا تكسر له عظما وسبح فى بطن الحوت - فسمعت الملائكة تسبيحه عظما وسبح فى بطن الحوت - فسمعت الملا ئكة تسبيحه - فقالو يارينا انا نسمع صوتا ضعيفا بارض غريبة قال ذالك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر - رواه ابن جرير.

(ابن كثير ج ٣ ص ١٩١ - ١٩٢)

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এক মুহাদ্দিসের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলে করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইউনুস (সাঃ)-কে মাছের পেটে বন্দী করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি হযরত ইউনুসকে ধরার জন্য এক মাছকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন, যেন তার শরীরের মাংস ক্ষত-বিক্ষত এবং হাড্ডি যেন ভেঙ্গে না যায়।

হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে আল্লাহ্র তাসবীহ্ পড়তে আরম্ভ করলেন। ফিরিশতারা হযরত ইউনুসের আওয়াজ শুনে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্! আমরা এক অপরিচিত জায়গা থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, তিনি কে?

আল্লাহ্ তায়ালা উত্তরে বললেন, তিনি আমার বান্দাহ্ ইউনুস (আঃ)। তিনি আমার নাফরমানী করেছেন, তাই তাঁকে আমি মাছের পেটে সমুদ্রের মধ্যে বন্দী করে রেখেছি।

(তাফসীরে ইবনে কাছির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯১-১৯২)

হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে তাবেয়ীনদের বর্ণনা

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن الجبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه اذكشف العذاب عن قومه بعد ما اوعد هم -

(معالم التنزيل)

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রাঃ), সায়ীদ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং অন্য আরও একদল বলেন, হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার উপর রাগান্বিত হয়ে তাঁর জাতিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। রাগান্বিত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তিনি তাঁর জাতিকে আযাব আসার হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিলেন।

وقال الحسن انما غاضب ربه عزوجل من اجل انه امره بالمسيرالى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم الله فسأل ربه ان ينظره يتأهب للشخوص اليهم فقيل له ان الامراسرع من ذالك حتى سأل ان ينظرالى ان يأخذنعلا يلبسها فلم ينظروكان فى خلقه ضيق فذهب مغاضا - (معالم التنزيل)

হযরত হাসান বসরী বলেন, রাগান্বিত হওয়ার কারণ এ ছিল যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তাঁর জাতির কাছে গিয়ে আযাবের ভয় দেখানো ও তাদের সম্মুখে সত্যের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ইউনুস আল্লাহ তায়ালার কাছে সময় চেয়ে দরখাস্ত করলেন যাতে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে জাতির কাছে পৌছেন। আল্লাহ্ তায়ালা উত্তরে বললেন, এ কাজ অনতিবিলম্বে করতে হবে, এতে সময় দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

তিনি পুনরায় দরখাস্ত করলেন যে, আমাকে জুতা পরার সময়টুকু দেয়া হোক।

কিন্তু তাও দেয়া হল না যেহেতু ইউনুস (আঃ)-এর মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল, তাই তিনি রাগান্বিত হয়ে চলে গেলেন।

وقال وهب بن منبه ان يونس كان عبدا صالحا وكان فى خلقه

ضيق فلما حمل عليه اثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل فقذفها بين يديه وخرج هاربا منها - فلذالك اخرجه الله من اولى للمغرن الرسل وقال نبيه محمداصلعم فاصبر كما صبر اولوا الغزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت -

(معالم التنزيل ج ٤ ص ٢٥٨)

ওহাব বিন মুনাববাহ্ বলেন, ইউনুস (আঃ) একজন নেক বান্দাহ্ ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল রুক্ষ। যখন তাঁর উপর নবুয়তের দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হল তখন তিনি এর নীচে এমনভাবে ধসে গেলেন, যেমন উটের দুর্বল বাচ্চা ভারী বোঝার নীচে ধসে যায়। এ জন্য তিনি নবুয়তের বোঝা ওখানে ফেলে দিয়ে পলায়ন করলেন। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নাম উচ্চ মর্যাদাশীল নবীদের নামের সূচী থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলে করিম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, উচ্চ মর্যাদাশীল রাসূলদের মত ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালা নবী (ইউনুস)-এর মত হইও না।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইউনুস (আঃ) থেকে রিসালতের দায়িত্ব আদায়ে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল–কথাটির উপর কেউ কেউ আপত্তি জানালে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাফহীমুল কোরআনের পরবর্তী সংস্করণে তা বাদ দিয়ে দেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, অনুরূপ কথা হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রাঃ), সায়ীদ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং হযরত হাসান বসরী, ওহাব বিন মুনাবাহ, কাতাদাহ, আল্লামা আলুসী, ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানবীও বলেছেন। অতএব মুফতি আহমদ সাহেবানদের ফতোয়া অনুযায়ী তাঁরাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহির্ভুত? (نعوذبالله) !

মাওলানাকে ঘায়েল করতে গিয়ে তারা কি সর্বনাশই না করল সাহাবা, তাবেয়ী এবং সলফে সালেহীনদের এক জামায়াতকে সুন্নাত জামায়াত থেকে বের করে দিল। কি হাস্যকর ব্যাপার।

তাকলীদ

তাক'লীদ বলা হয় কোন ব্যক্তির এমন কোন কথার উপর কারো আমল করা, যে কথার দলিল তার জানা নেই।

এটিও এমন একটি মাসআলা যেটাকে পুঁজি করে মাওলানার বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে অতি সহজে বিভ্রান্ত করে। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তারা তাঁকে পথভ্রষ্ট, লা-মাযহাবী ইত্যাদি বলে থাকে। নীচে এ ব্যাপারে মাওলানার বক্তব্য এবং এর সাথে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হলো যাতে পাঠক ভাইয়েরা বিচার করতে পারেন যে, সত্যিই কি মাওলানা এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট না অপবাদকারীদের নিছক একটা অপবাদ মাত্র।

তাকলীদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য

اسلام میں دراصل تقلید سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی نہیں ھے اور رسول اللہ صہ کی تقلید بھي اس بنا پرہے کہ آپ جوکچھ فرما تے ہیں اور عمل کر تے ہیں وہ اللہ کی اذن اور فرمان کي بنا پر ہے ورنہ اصل میں تو مطاع اور آمر اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں -

ائمہ کي پیروی کی حقیقت صرف یہ ھے کہ ان ائمہ نے اللہ اور رسول کے احکام کی چھان بین کی آیت قرآنی اور سنت رسول سے معلوم کیا کہ مسلمان کوعبادات اور معاملات میں کس طریق پر چلنا چاہئے - اوراصول شریعت سے جزی احکام کا استنباط کیا - لہذا وہ بجائے خود آمرونا ھی نہیں ہیں نہ بذات خود مطاع اور

متبوع ہیں - بلکہ علم نہ رکھنے والے کیلئے علم کا ایك معتبرذریعہ ہیں جو شخص خود احکام الہی اور سنن نبوی میں نظر بالغ نہ رکھتا ہواور خود اصول سے فروع کا استنباط کر نیکا اہل نہ ہو - اسکیلئے اسکے سوا چارہ نہیں کہ علماءاورائمہ میں سے جس پر بھی اسے اعتماد ہو - اس کي بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے - اگر کو ئی شخص اس حیثیت سے انکی پیروی کرتاہے تواس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے - کوئی شخص ان کوبطورخودآمر وناھی سمجھے یاانکی اطاعت اس انداز سے کرے جواصل آمروناھی کی اطاعت ھی میں اختیار کیا جا سکتاہے - یعنی ائمہ میں سے کسی کے مقررکر دہ طریقے سے ھٹنے کواصل دین سے ھت جانیکا ھم معنی سمجھے اور اگرکسی ثابت شدہ حدیث یاصریح ایات قرانی کے خلاف ان کاکوئی مسئلہ پایا جائے تب بھی وہ اپنے امام ہي کی بیروی پراصرارکرے تویہ بلا شبہ شرك ہوگا -

(ترجمان القران رجب ، شوال سـ٦٣ھ جولائی اکتو بر سـ ٤٤ع - رسائل ومسائل حصہ اول)

ایك صاحب علم ادمی کوبراہ راست کتاب وسنت سے حکم صحیح معلوم کر نیکی کوشش کر نی چا ہئے - اور اس تحقیق ووتجسس میں علماء وسلف کي ماھرانہ آراءسے بھی مدد لینی چاہئے نیز اختلا فی مسائل میں اسے ھر تعصب سے پاك ھوکرکھلے دل سے تحقیق کرنا چاہئے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب وسنت سے زیادہ مطابقت رکھتاھے پھر جو چیر حق معلوم ھو اسی کی پیروی کرنی چاہئے - (رسائل ومسائل حصہ اول)

ইসলামে তাকলীদ প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কারও হয় না। আর রাসূল (সাঃ)-এর তাকলীদও এ হিসেবে যে, তিনি যা কিছু বলেন এবং করেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যের মালিক ও আদেশদাতা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ নয়।

ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্য এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র ও রাসূলের হুকুমসমূহের অনুসন্ধান করেছেন। কোরআন শরীফের আয়াত ও রাসূল (সাঃ)-এর হাদিস থেকে অবগত হয়েছেন যে, ইবাদত ও লেনদেনে মুসলমানদেরকে কোন্ পদ্ধতির উপর চলা উচিত। তাঁরা শরীয়তের মূল বিষয়সমূহ থেকে শাখা-প্রশাখা জাতীয় হুকুমসমূহ বের করেছেন। সুতরাং তারা নিজে কোন আদেশদাতা অথবা নিষেধদাতা নহেন এবং না তারা আনুগত্যের মালিক। বরং জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞান লাভের একটি নির্ভরযোগ্য উপায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমসমূহ এবং সুন্নাতে নববীর মধ্যে গভীর জ্ঞান এবং মৌলিক হুকুম থেকে শাখা-প্রশাখা জাতীয় হুকুম বের করার যোগ্যতা রাখে না, তার জন্য এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, ওলামায়ে কেরাম ও ইমামদের মধ্য থেকে যার উপর ভরসা হয় তাঁর বর্ণিত পদ্ধতির অনুসরণ করে। যদি কেউ এ হিসেবে তাঁদের অনুসরণ করে, তাহলে তার উপর কোন অভিযোগের অবকাশ নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাদেরকে আদেশকারী অথবা নিষেধকারী মনে করে কিংবা তাঁদের এ ধরনের আনুগত্য করে যেটা প্রকৃত আদেশকারী অথবা নিষেধকারীর বেলায় করা হয়। অর্থাৎ ইমামদের মধ্য থেকে কারও নির্ধারিত পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাওয়াকে আসল দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সমার্থক মনে করে এবং যদিও কোন প্রমাণিত হাদিস কিংবা পরিষ্কার আয়াতের বিপরীত কোন মাসআলা পাওয়া যায়, তবু সে তার ইমামের অনুসরণ করতেই থাকে, এটা নিঃসন্দেহে শিরক।

(তরজমানুল কুরআন, রজব, শাওয়াল, ৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ৪৪ ইং, রাসায়েল, মাসায়েল-১ম খণ্ড)

একজন আলিম ব্যক্তিকে সরাসরি কোরআন-হাদিস থেকে সঠিক হুকুম জানার চেষ্টা করা উচিত এবং এ অনুসন্ধানে পূর্ববর্তী ওলামাদের মূল্যবান রায়ের সাহায্য লওয়া উচিত। তাছাড়া বিরোধপূর্ণ মাসআলায় সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হয়ে খোলা মনে অনুসন্ধান করা উচিত যে, আয়িম্মায়ে মুজাতাহিদীনদের মধ্যে কার ইজ্‌তিহাদ কোরআন ও হাদিসের সাথে অধিক সম্পর্কশীল। এরপর যেটা হক মনে হয়, সেটারই অনুসরণ করা উচিত।

(রাসায়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড)

میرے نزدیك صاحب علم آدمی کیلئے تقلید ناجائزاور گناہ بلکہ اس سے کچھ شدیدتر چیز ھے - مگر یاد رھے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی کے طریقے اور اصول کا اتباع کرنا اور چیز ھے اورتقلیدکی قسم کھاکر بیٹھنا بالکل دوسری چیزھے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا - اور ایك مذھب فقہی سے دوسرے مذھب فقہی میں انتقال صرف اس صورت میں گناہ ھے جبکہ یہ فعل خواہش نفس کی بناپرھونہ کہ تحقیق کي بنا پر- (ترجمان- جولا ئی اکتوبر ۴۴ء) (رسائل ومسائل حصۂ اول)

আমার নিকট একজন আলিম ব্যক্তির জন্য তাকলীদ নাজায়েয এবং গুনাহ বরং এর চেয়েও মারাত্মক কোন কিছু। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, নিজের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কারো পদ্ধতি এবং উসূলের অনুসরণ করা এক জিনিস আর কারোর তাকলীদের কসম খেয়ে বসা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যেটাকে আমি সঠিক মনে করি না এবং এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে প্রত্যাবর্তন তখনই গুনাহ যখন এ কাজ নাফসের অভিলাষ পূরাণার্থে হয়, অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নয়।

(তরজামানুল কোরআন, রজব-শাওয়াল, ৬৩ হিঃ জুলাই, অক্টোবর ৪৪ ইং)

মাওলানার বক্তব্য থেকে প্রধানতঃ যে কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। একজন সাধারণ ব্যক্তি যার কোরআন-হাদিস সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তাকে অবশ্যই কোন না কোন ইমামের তাকলীদ করতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের বন্ধন তার উপর প্রয়োজনীয় নয়।

২। কোন ইমামকে প্রকৃত আদেশকারী বা নিষেধকারী মনে করে তার তাকলীদ করা এবং তার ইজতেহাদ কোরআন ও হাদিসের পরিষ্কার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাকলীদ করা নাজায়েয এবং গুনাহ।

৩। একজন আলীম ব্যক্তি যার কোরআন হাদিসের পাণ্ডিত্য আছে, মৌলিক হুকুমসমূহ থেকে আংশিক হুকুম বের করার যোগ্যতা আছে, তার তাকলীদ করা নাজায়েয। তার জন্য কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি হুকুম বের করা উচিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা মাওলানার কথাগুলো পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য ওলামাদের অভিমতের সাথে মিলিয়ে দেখি যে, তাঁর অভিমত কতটুকু আপত্তিকর।

সাধারণ ব্যক্তির তাকলীদ সম্পর্কে আল্লামা শামী (রহঃ)-এর অভিমত

وقد شاع ان العامى لا مذهب له اذ علمت ذالك ظهرلك ان ما ذكر عن النسفى من وجوب اعتقادان مذهبه صواب يحتمل الخطاء مبنى على انه لا يجوزتقليد المفضول وانه يلزمه التزام مذهبه وذالك لايتأتى فى العامى - (ردالمختار ج اص ٤٥)

সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারে এটা প্রসিদ্ধ যে, তার জন্য কোন মাযহাবের বন্ধন জরুরী নয়। এতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইমাম নাসায়ী যে কথা বলেছেন– 'নিজের মাযহাব সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, এটা হক, ভুলের শুধু সন্দেহ রাখে মাত্র।'

এটা এই নীতির উপর নির্ভরশীল যে, অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাশীল ব্যক্তির তাকলীদ জায়েয নয় এবং মানুষের উপর তার মাযহাবের উপর টিকে থাকা জরুরী। অথচ সাধারণ মানুষের বেলায় এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(রোদ্দুল মুখতার, ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)

ইবনে হোমাম (রহঃ)-এর অভিমত

ان اخذ العامى بما يقع فى قلبه انه اصوب اولى وعلى هذا اذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الاولى ان يأخذبما يميل اليه قلبه منهما - وعندى لو اخذ بقول الذى لايميل اليه قلبه جازلا ن ميله وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل -

(شامى ج ١ ص ٤٥)

সাধারণ ব্যক্তির জন্য এই ফতোয়ার উপর আমল করা ভাল, যেটা তার নিকট অধিক সঠিক বলে মনে হয়। যদি সে দু'জন মুজতাহিদের বিভিন্ন ফতোয়া লাভ

করে, তবে তার জন্য এ ফতোয়ার উপর আমল করা ভাল, যেটার প্রতি তার মনের সন্তুষ্টি হয়। কিন্তু যদি সে এ ফতোয়ার উপরই আমল করে যেটার প্রতি তার মনের সন্তুষ্টি নয়, তবে এটাও আমার কাছে এজন্য জায়েয যে, তার মনের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি দু'টাই সমান। তার উপর ওয়াজিব তো শুধু কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করা, আর এ কাজ সে করেছে। (শামী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা – ৪৫)

আবু বকর জাওজযানী (রহঃ)-এর ফতোয়া

فی التاتارخانیة حکی ان رجلامن اصحاب ابی حنیفة رح خطب الی رجل من اصحاب الحدیث ابنته فی عهد ابی بکر الجوزجانی فابی ان یجیبه الا ان یترك مذهبه فیقرأ خلف الامام ویرفع یدیه عند الانحطاط ونحوذالك فاجابه فزوجه فضال الشیخ بعد ما سئل عن هذه واطرق رأسه - النكاح جائز ولكن اخاف علیه ان یذهب ایمانه وقت النزع لانه ترك مذهب الذی هو حق عنده واستخف به لاجل جیفة منتنة ولوان رجلا بری من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا ماجورا - اما انتقال غیره من غیر دلیل بل لما یرغب من عرض الدنیا وشهوتها فهو المذموم الاثم المستوجب للتادیب والتعزیر لارتكابه المنكر في الدین واستخفافه بدینه ومذهبه -

(رد المختار -ج ٣ص ٢٦٣)

তাতার খানিয়া নামক কিতাবে এক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু বকর জাওজযানী (রহঃ)-এর সময়ে এক হানাফী মাযহাব মতাবলম্বী লোক আহলে হাদিস এক ব্যক্তির মেয়ের জন্য বিয়ের পয়গাম পাঠান।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি পয়গাম মনজুর না করে বললো, যদি তুমি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে আহলে হাদিসের নীতি গ্রহণ করে ইমামের পিছনে কিরাত এবং রাফে ইয়াদাইন বা হাত উঠানোর উপর আমল কর তাহলে পয়গাম কবুল করব।

হানাফী ব্যক্তি এমনটি করে নিলেন এবং বিয়ে হয়ে গেল।

আবু বকর জাওজযানী (রহঃ)-কে যখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল তখন তিনি একটু সময় চুপ থেকে বললেন, বিয়ে তো জায়েজ হয়েছে, কিন্তু এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমার ভয় হয় যে, কখনও বিরোধের সময় তার ঈমান চলে যায় নাকি? কেননা সে এমন মাযহাবকে ছেড়েছে তার নিকট হক ছিল, কিন্তু একটা তুচ্ছ লোভের কারণে সে এ মাযহাবের অবমাননা করল।

হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি সঠিক ইজতেহাদের ভিত্তিতে তার নিজের মাযহাবকে ছেড়ে দেয়, তবে এটা একটা নেক কাজ এবং এ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট পুরস্কৃত হবে। কিন্তু যদি কোন দলিল ব্যতীত শুধুমাত্র দুনিয়ার লোভ এবং নফসের ইচ্ছা পুরণার্থে প্রত্যাবর্তন করে, তবে এটা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কেননা সে অপছন্দীয় একটি কাজ করেছে এবং দ্বীনকে হেয় ও মাযহাবের সাথে ঠাট্টা করেছে যেটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।

(রাদ্দুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-২৬৩)

আল্লামা শারান বালালী (রহঃ)-এর অভিমত

ليس على الانسان التزام مذهب معين وانه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غيره مستجمعا شروطه ويعمل بامرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالاخرى وليس له ابطال عين ما فعله بتقليد امام اخر وقال ايضا ان له التقليد بعد العمل كما اذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلا نها فى مذهبه وصحتها فى مذهب غيره فله تقليده ويجتزأ بتلك الصلواة على ماقال فى البزازية - انه روى عن ابى يوسف انه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم اخبر بفارة ميتة فى بير الحمام فقال اذا نأ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا - (شامى ج ص ٧٠)

মানুষের উপর কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের বন্ধন জরুরী নয় এবং মানুষ আংশিক মাসআলায় তার নিজের মাযহাবের বিপরীত মাযহাবের উপরও আমল করতে

পারে। কিন্তু শর্ত হল, সে যেন এ মাযহাবের সবগুলো শর্তের উপর দৃষ্টি রাখে। তার জন্য এটাও জায়েয আছে যে, দুটো ভিন্ন ঘটনায় পরস্পর বিরোধী দুটো ভিন্ন হুকুমের উপর আমল করা, যেটা দুটো মাযহাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যে আমল সে তার পূর্ববর্তী ইমামের তাকলীদ করতে গিয়ে করেছে, ওটা অন্য ইমামের তাকলীদের পর বাতিল করা যাবে না।

আল্লামা শারান বালালী আরও বলেছেন, কোন আমল করার পরও অন্য মাযহাবের তাকলীদ করা যেতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি এমন মনোভাব নিয়ে নামায পড়ল যে, এটা তার নিজের মাযহাব অনুসারে সঠিক আছে, পরে সে জানতে পারল এটা অন্য মাযহাব অনুসারে তো সঠিক আছে। কিন্তু নিজের মাযহাব অনুসারে সঠিক নয়। এমতাবস্থায় সে অন্য মাযহাবের তাকলীদ করে এটাকে যেন সঠিক মনে করে এবং এর উপরই যেন ভরসা করে।

বাজ্জাজিয়া নামক কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা গোসলখানার পানি দিয়ে গোসল করে জুমআর নামায আদায় করলেন। পরে তাঁকে জানানো হল যে, গোসলখানার কূপে মরা ইঁদুর ছিল।

তিনি বললেন, কোন বাধা নেই, আমি আমার মদীনাবাসী ভাইদের কথার উপর আমল করব যে, পানি দু'কুল্লা হলেও নাপাক হয় না।

(শামী, ১ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

আল্লামা মুহিবুল্লাহ (রহঃ)-এর উক্তি

رلو التزم مذهبا معينا كمذهب ابى حنيفة اوغيره فهل يلزم عليه الاستمرار ؟ فقيل نعم - وقيل لا - اذ لا واجب الاما اوجب الله ولم يوجب على احد ان يتمذهب بمذهب رجل من الائمة وفى التحريروهو الغالب على الظن لعدم مايوجبه شرعاً -

(مسلم الثبوت - ص ۲۹۲)

যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নেয়, যেমন ইমাম আবু হানিফার মাযহাব কিংবা অন্য কারও মাযহাব, তাহলে কি সর্বদা এর উপর স্থির থাকা ওয়াজিব?

কেউ কে 'হ্যাঁ' এবং কেউ কেউ 'না' বলেছেন। কেননা ওয়াজিব ঐ জিনিসই হয়, যা আল্লাহ্ তায়াল্লা ওয়াজিব করেন। আর আল্লাহ তায়ালা এটা কারও উপর ওয়াজিব করেন নাই যে, এক ব্যক্তি সর্বদা একই মাযহাবের বন্ধনে থাকবে। ইবনে হোমাম 'তাহরীর' নামক কিতাবে বলেন, আমারও মনে ঝোঁক এদিকে যে, বন্ধন প্রয়োজনী নয়। কেননা বন্ধনের কোন শরয়ী দলিল নেই।

(মুসাল্লামুছ্ছুবুত, পৃঃ –২৯২)

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর ফতোয়া

الذى اقول به ان للمنتقل احوالا – احدها ان يكون الحامل له على الانتقال امراد نيويا اقتضته الى الرفاهية اللائقة به كحصول وظيفة او مرتبة او قرب من الملوك واكابر الدنيا فهذاحكمه حكم مهاجرام قيس لانه الاعزمن مقاصده –

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে প্রত্যাবর্তনের হুকুম কি?

উত্তরে ইমাম সাহেব বিস্তারিত উত্তর দেন। তিনি বলেনঃ

এ ব্যাপারে আমার অভিমত হল যে, প্রত্যাবর্তনকারীর বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে, প্রথম হল, প্রত্যাবর্তনের কারণ যদি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে হয়। যেমন–চাকরি, পদমর্যাদা লাভ কিংবা রাজা-বাদশাহ্দের নৈকট্য লাভ, তাহলে তার অবস্থা মুহাজীরে উম্মে কায়েসের' মত। কেননা দুনিয়ার সুযোগ সুবিধাই এ প্রত্যাবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

الثانى ان يكون الحامل له على الانتقال امرادنيويا لكنه عامى لا يعرف الفقه وليس له من المذهب سوى الاسم فمثل هذا امره خفيف اذا انتقل عن مذهبه الذى كان يزعم انه متقيد به ولا يبلغ الى حد التحريم لانه الى الان عامى لا مذهب له فهو كمن اسلم جديدا له التمذهب باى مذهب من مذاهب الائمة –

দ্বিতীয় প্রকার হল, প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য পার্থিবই, কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারী আলিম নয় বরং সাধারণ ব্যক্তি। মাযহাবের ব্যাপারে নাম ছাড়া অন্য কিছুই তার জানা নেই। এমন ব্যক্তি যদি তার পূর্ব সম্পর্কিত মাযহাব থেকে প্রত্যাবর্তন করে ফেলে, তবে এটা এমন কোন মারাত্মক অপরাধ নয় যে, হারামের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এটাকে উত্তম কাজ নয় বলে অভিহিত করা যাবে। কেননা এ ব্যক্তি একজন সাধারণ মানুষ যার উপর নও মুসলিমের মত কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের বন্ধন জরুরী নয়। যে মাযহাবই তার পছন্দ হয়, সেটারই তাকলীদ করা তার জন্য জায়েয।

الثالث ان يكون الحامل له امرا دنيو ياكذالك ولكنه من القدر الزائد عادة على ما يليق بشانه وهو فقيه فى مذهبه واراد ـ

الانتقال لغرض الدنيا الذى هو من شهوات نفسه المذمومة فهذا امره اشد وربما وصل الى حد التحريم لتلاعبه بالاحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا عدم اعتقاده فى صاحب المذهب الاول انه على كمال هدى من ربه اذلواعتقد ذالك ما انتقل عن مذهبه -

তৃতীয় প্রকার হল, প্রত্যাবর্তনের কারণ দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু এটা এ পরিমাণের অতিরিক্ত, যেটা বাহ্যত তার মর্যাদার উপযোগী। তা ছাড়া সে তার মাযহাব সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রত্যাবর্তনে নাফসের ইচ্ছার নিন্দনীয় অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। এমন ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটি অত্যন্ত মারাত্মক। এটা অনেক সময় হারামের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেননা এতে একদিকে শুধুমাত্র দুনিয়ার লোভে শরীয়তের হুকুমের সাথে খেলা করা হয়. অন্যদিকে প্রথম ইমামের বেলায় এ খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে পূর্ণ হেদায়েতের উপর নন। নতুবা সে তার মাযহাব থেকে প্রত্যাবর্তনই করত না।

টীকা – ১ ঃ এক সাহাবী উম্মে কায়েস নামী এক মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই মদী হিজরত করেছিলেন, এ জন্য তিনি মুহাজীরে উম্মে কায়েস নামে খ্যাত। প্রকৃত হিজরতকারীর মর্যাদা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

الرابع ان يكون الانتقال لغرض دينى ولكنه كان فقيها فى مذهبه وانما انتقل لترجيح المذهب الاخر عنده لماراه من وضوح ادلته وقوة مداركه فهذا يجب عليه الانتقال اويجوز له وقد اقر العلماء من انتقل الى مذهب الشافعى حين قدم مصرو كانوا خلقا كثيرا مقلدين للامام مالك (رع) -

চতুর্থ প্রকার হল, প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বীনের জন্য এভাবে যে, প্রত্যাবর্তনকারী নিজের মাযহাবের একজন ফেকাহবিদ এবং তিনি প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্র এ ভিত্তির উপর করেছেন যে, অন্য মাযহাবকে তিনি পরিষ্কার ও শক্তিশালী দলিলের কারণে প্রাধান্যযোগ্য মনে করেছেন। এমন ব্যক্তির জন্য অন্য মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব কিংবা কমপক্ষে জায়েয। কেননা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন মিসরে তশরীফ আনেন তখন যে সমস্ত লোক তাঁর মাযহাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তাদেরকে ওলামায়ে কেরাম প্রত্যাবর্তনের উপর থাকতে দিয়েছেন, আর ঐ সমস্ত লোক ইমাম মালেকের মাযহাবের অনুসারী ছিল।

الخامس ان يكون انتقاله لغرض دينى لكنه كان عاريا عن الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل له منه شى ووجد مذهب غيره استهل عليه بحيث يرجوسرعة ادراكه والتفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعاً ويحرم عليه التخلف لان تفقه مثله على مذهب امام من الائمة الاربعة خير من الاستمرارعلى الجهل واظن ان هذا هوالسبب فى تحول الطحاوى رحـ حنفيا بعدان كان شافعيا -

পঞ্চম প্রকার হল প্রত্যাবর্তন দ্বীনি উদ্দেশ্যেই, কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারী কোন ফেকাহবিদ নয়। যদিও সে তার মাযহাবের ব্যাপারে জ্ঞান লাভে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু কোন জ্ঞান লাভ হয়নি এবং অন্য মাযহাবকে নিজের জন্য সহজ মনে করেছে। এমনকি তার এ আশা হয়েছে যে, এক মাযহাব থেকে তাড়াতাড়ি অভিজ্ঞতা অর্জন করে আলিম এবং ফকীহ্ হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যাবর্তন অকাট্যভাবে ওয়াজিব এবং পূর্ব মাযহাবের উপর টিকে থাকা তার জন্য হারাম।

কেননা চার মাযহাব থেকে কোন এক মাযহাবের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করা মূর্খ থাকার চেয়ে অনেক ভাল। ইমাম তাহাবীর ব্যাপারে আমার এ ধারণা যে, তিনি বোধ হয় এ কারণেই শাফেয়ী মাযহাবের থেকে হানাফী মাযহাবে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

السادس ان يكون انتقاله لا لغرض دينى ولادنيوى بان كان مجردا عن القصدين جميعا فهذا يجوز للعامى - اما الفقيه فيكره له او يمنع عنه لانه قد حصل فقه ذالك المذهب الاول ويحتاج الى زمن اخريحصل فيه فقه المذهب الاخرفيشغله ذالك عن العمل بما تعلمه قبل ذالك وقديموت قبل تحصيل مقصوده من المذاهب الاخر- فالاولى لمثل هذا ترك ذالك - (ميزان صف٤٢)

৬ষ্ঠ প্রকার হল প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বীনিও নয়, দুনিয়াও নয়, অর্থাৎ প্রত্যার্তনে তার উদ্দেশ্য কোনটাই নয়। এ রকমের প্রত্যাবর্তন সাধারণ মানুষের জন্য জায়েয আছে। কিন্তু কোন ফেকাহবিদের জন্য এটা ভাল নয়। কেননা তিনি প্রথম মাযহাবের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করেছেন এবং দ্বিতীয় মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে যে সময়ের প্রয়োজন হবে ঐ সময়ে তাকে তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের উপর আমল করতে ঐ প্রত্যাবর্তন বাধার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া ঐ ব্যক্তি অন্য মাযহাব সম্পকে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পূর্বে তার মৃত্যুও হতে পারে এবং অন্য মাযহাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ না-ও হতে পারে। এ জন্য এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যাবর্তন না করাই ভাল।

(মিজান, পৃষ্ঠা-৪২)

নাজায়েয তাকলীদ সম্পর্কে শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ)-এর ফয়সালা

ومنها تقليد غير المعصوم اعنى غير النبى صلى الله عليه وسلم وحقيقته ان يجتهد احد من علماء الامة فى مسئلة فيظن متبعوه انه على الاصابة قطعاً اوظنا غالبا فيردوا به حديثا

صحيحًا - وهذا التقليد غيرما اتفق عليه الامة المرحومة فانهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بان المجتهدقد يخطي وثصيب ومع الاستشراف لنص النبى صلى الله عليه وسلم فى المسئلة والعزم على انه من ظهرله حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك التقليد وتبع الحديث - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى - "اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله" انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذااحلو الهم شئيا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه -

(حجة الله البالغة - ج ١- ص ٢٦٣ - ٢٦٤)

নবী ছাড়া অন্য কারও তাকলীদ করা তাহরীফ বা পরিবর্তনের মধ্য থেকে একটি পরিবর্তন। এর তাৎপর্য হল এই যে, ওলামাদের মধ্য থেকে কোন আলিম যদি কোন মাসআলায় ইজতেহাদ করেন, আর তাঁর অনুসারীরা এটাকে নিশ্চিত সত্য এবং সঠিক মনে করে এর মোকাবিলায় সহীহ হাদিসকে উড়িয়ে দেন।

এটা ঐ তাকলীদ নয় যেটার উপর জাতি একতাবদ্ধ। কেননা জাতি মুজতাহিদীনদের যে তাকলীদের উপর একতাবদ্ধ সেটা হল, মুজতাহিদের ব্যাপারে এ আকিদাও থাকা উচিত যে, তার থেকে ভুল এবং শুদ্ধ দুটোই হতে পারে। তাছাড়া এ জাতীয় মাসআলায় রাসূলে করিম (সাঃ)-এর ফয়সালারও অপেক্ষা করা উচিত এবং এ মনোভাব থাকা উচিত যে, তাকলীকৃত মাসআলার বিপরীত যখনই কোন সহীহ হাদিস পাওয়া যাবে তখনই তাকলীদ ছেড়ে সহীহ হাদিস গ্রহণ করা হবে। রাসূলে করিম (সাঃ) কোরআন শরীফের এক আয়াত اتخذوا احبار هم و رهبانهم –এর তাফসীরে বলেছেন, ইহুদীরা তাদের ওলামা, মাশায়েখ এবং দরবেশদের পূজা করত না বরং ওলামারা যেটাকে হালাল বলতেন তারাও সেটাকে হালাল মনে করত এবং তারা যেটাকে হারাম বলত ওরাও সেটাকে হারাম মনে করত। আর এটার নামই ওলামাদেরকে 'রব' বানানো যেটার অভিযোগ কোরআন তাদের উপর করেছে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালীগাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৬৩-২৬৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

فان بلغنا حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذى فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذالك التخمين فمن اظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين (حجة الله البالغة - ج اص ٣٦٥ - ٣٦٦)

যদি আমাদের কাছে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর হাদিস সঠিক সনদসহ্ পৌঁছে, যে রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর ফরয করেছেন এবং মুজতাহিদের মাযহাব যদি এ হাদিসের উল্টো হয় আর এ অবস্থায় যদি আমরা সহীহ হাদিস ছেড়ে মুজতাহিদের ধারণাকৃত একটা কথার অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব?

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালীগাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৩৬৬)

ইবনে হাজাম (রহঃ) যিনি তাকলীদ করাকে সম্পূর্ণভাবে হারাম বলেন, তাঁর এ কথার পর্যালোচনা করতে গিয়ে হযরত শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব বলেন ঃ

وقول ابن حزم (من ان التقليد حرام) انما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو فى مسئلة واحدة -

ইবনে হাজামের এ ফতোয়া (তাকলীদ করা হারাম) সে ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে ইজাতেহাদের যোগ্যতা রাখে- যদিও একটি মাসআলায় হোক না কেন।

وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بكذا اونهى عن كذا اوانه ليس بمنسوخ-

সে ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য, যার কাছে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে যে, কোন এক ব্যাপারে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর আদেশ কিংবা নিষেধ এ রকম কিংবা এটা রহিত হয়নি।

وفيمن يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى انه يمتنع من مثله الخطاء وان ما قاله الصواب البتة واضمزفى نفسه ان لا يترك تقليده وان ظهر الدليل على خلافه -

আর এটা ঐ সাধারণ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে এ বিশ্বাস নিয়ে কোন ইমামের তাকলীদ করে যে, তার থেকে কোন ভুল হয় না বরং তিনি যা বলেন তা সঠিকই বলেন। তা ছাড়া সে তার মনে মনে এ ফয়সালা করে নিয়েছে যে, আমি আমার ইমামের তাকলীদ পরিত্যাগ করব না, যদিও এর বিপরীত কোন পরিষ্কার দলিল মেলে ।

وفيمن لا يجووان يستفتي الحنفى مثلا شافعيا وبالعكس ولايجوز ان يقتدى الحنفى بالامام الشافعى مثلا فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى وناقص الصحابة والتابعين - (حجة الله البالغة - ج اص ٣٦٣ - ٣٦٥)

ইবনে হাজামের এ ফতোয়া সে ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য, যিনি মাযহাবী বিদ্বেষের কারণে এটা জায়েই মনে করেন না যে, কোন হানাফী মতাবলম্বী লোক শাফেয়ী মতাবলম্বী লোকের কাছে অথবা কোন শাফেয়ী কোন হানাফীর কাছে দ্বীনের ব্যাপারে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করুক। এ ধরনের তাকলীদ প্রথম যুগের ইজমা বা ঐক্যমতের বিরোধী এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের রীতির বিপরীত। (হুজ্জাতুল্লাহীল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৩-৩৬৫)

আলীম ব্যক্তির তাকলীদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর অভিমত

اما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة كمااذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول اعدل - (فتاوى ابن تيميه رح ج ٢ ص٣٨٤)

দলিল গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তির তাকলীদ সম্পর্কে কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে হারাম বলেছেন, আবার কেউ কেউ প্রয়োজনে জায়েয মনে করেছেন। যেমন অনুসন্ধান করে দলিল দ্বারা মাসআলা বের করার সময় যদি না মেলে তাহলে জায়েয আছে। আর এ মতটিই হল মধ্যমপন্থী মত। (ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৪)

তিনি আরও বলেন ঃ

اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه ان القول الاخر ليس معه ما يدفع به النص فهذايجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الانفس وكان اكبر العصاة لله ولرسوله -

(فتاوى ابن تيميه ج ٢ ص ٣٨٥)

কিন্তু পূর্ণ ইজতেহাদের উপর সক্ষম ব্যক্তি, যিনি এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, অমুক মাসআলায় এমন কোন দলিল নেই, যা দ্বারা পরিষ্কার হুকুমকে হটিয়ে দেয়া যায় এমতাবস্থায় তাঁকে পরিষ্কার হুকুমের অনুসরণ করতে হবে। আর যদি না করেন তাহলে তিনি নাফসের অনুসারী এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের সবচেয়ে বড় নাফরমান। (ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৫)

তাকলীদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

میں اصل میں تو ایك امام کا پیرو ہوں جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھے - البتہ فقہی مسائل میں میرا طریقہ یہ ھے کہ جس مسئلہ کی مجھے تحقیق کا موقعہ نہیں ملتا اس میں امابو حنیفہ رح کی پیروی کرتاھوں - کیونکہ انکے مذھب کے اکثر مسائل کو میں نے آپ نے اصلی امام کی تعلیم کے زیادہ موافق پایاھے - مگر جس مسئلہ میں مجھے تحقیق کا موقع ملتا ھے اس میں چاروں اماموں کے مذاھب پر نظرڈالتاھوں اور جس کی تحقیق کوقرآن وحدیث کے منشاء سے زیادہ قریب پاتا ہوں - اسکی پیروی کرتاہوں -

অর্থাৎ আমি প্রকৃত পক্ষে একই ইমামের অনুসারী- যাঁর নাম মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। হ্যাঁ, ফিকহী মাসআলায় আমার রীতি হল, যে মাসআলা আমি তাহকীক বা অনুসন্ধানের সুযোগ না পাই, এতে আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অনুসরণ করি। কেননা তাঁর মাযহাবের অধিকাংশ মাসআলা আমার প্রকৃত ইমামের শিক্ষার অধিক অনুককূলে পেয়েছি। কিন্তু যে মাসআলা আমার অনুসন্ধানের সুযোগ মেলে, এতে আমি চার ইমামের মাযহাবের উপর দৃষ্টি দেই এবং যেটাকে কুরআন ও হাদিসের উদ্দেশ্যের অধিক নিকটবর্তী পাই সেটারই অনুসরণ করি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এবার আপনারাই বিচার করুন, তাকলীদের ব্যাপারে মাওলানা কি পথভ্রষ্ট? না তাঁর বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তা অপপ্রচার মাত্র?

বিনা অযুতে

সাজদায়ে তেলাওয়াতের মাসআলা

এ মাসআলায়ও অপপ্রচারকারীরা তাদের চিরাচরিত প্রথায় মাওলানাকে পথভ্রষ্ট বলে অভিযুক্ত করছেন। সুতরাং আসুন, আমরা এ ব্যাপারে মাওলানার বক্তব্যকে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর হাদিস, সাহাবায়ে কিরামের আমল এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কিরামের অভিমতের সাথে মিলিয়ে দেখি তাদের অভিযোগ কতটুকু সত্য?

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) -এর বক্তব্য

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তার বিখ্যাত তাফহীমুল কোরআন ২য় খণ্ড সূরা-আল আরাফে তেলাওতে সাজদার শর্তের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

"اس سجدے کیلئے جمہور انہیں شرائط کے قائل ہیں جونمازکی شرطیں ہیں - یعنی باوضو ہونا ، قبلہ رخ ہونا اور نماز کیطرح سجدے میں زمیں پرسررکھنا - لیکن جتنی بھی احادیث سجدۃ تلاوت کے باب میں ہم کوملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں ھے - ان سے تو یہی معلوم ہوتا ھے کہ أیت سجدہ سن کر جوشخص جہاں جس حالت میں ہو جھك جائے خواہ باوضو ہویا نہو سلف میں بھی ایسی شخصیتین ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقہ پرتھا -

(تفہیم القران - ج ۲ ص ۱۱۶)

এ সাজদার জন্য জমহুর ওলামা ঐ সমস্ত শর্ত আরোপ করেন, যে সমস্ত শর্ত নামাযের রয়েছে। অর্থাৎ অযু থাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং নামাযের মত জমিতে মাথা রাখা। কিন্তু সাজদায়ে তেলাওতের ব্যাপারে যতটি হাদিস আমি পেয়েছি, ওগুলোতে এ শর্তগুলোর কোন দলিল বিদ্যমান নেই। এ হাদিসগুলো দ্বারা এটাই মনে হয় যে, সে সময়ে সাজদার আয়াত শুনে যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় থাকে না কেন, যেন ঝুঁকে যায়। অযু থাকুক আর নাই থাকুক। পূর্ববর্তী ওলামাদের মধ্যেও এমন ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় যাদের আমল এরূপ ছিল।

(তাফহীমুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৬)

মাওলানার বক্তব্য থেকে যা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হচ্ছে, তেলাওয়াতের সাজদা নামাযের সাজদার মত নয়। নামাযের সাজদার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, তেলাওয়াতর সাজদার জন্য সে শর্ত নয়। বরং তেলাওয়াতের সাজদা বিনা অযুতে জায়েয আছে।

মাওলানার এ অভিমতকে হাদিসে রাসূল ও ওলামায়ে কিরামের অভিমতের সাথে মিলিয়ে দেখা যাক, তিনি কি সত্যিই এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট।

হাদিসের আলোকে সাজদায়ে তেলাওয়াত

عن ابن عمر رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد فى الارض حتى ان الراكب يسجد على يده - (ابوداود)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে করিম (সাঃ) সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। সব লোক সাজদা করল। তাদের মধ্যে আরোহীও ছিল। আরোহীরা তাদের হাতের উপর সাজদা করল।

(আবু (আবু দাউদ)

عن ابن عمر رض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فى غير الصلواة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته - (ابوداؤد)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (সাঃ) আমাদের সম্মুখে নামাযের বাইরে সূরা তেলাওয়াত করতেন এবং সাজদা করতেন। আমরাও তাঁর সাথে সাজদা করতাম। এমনকি অত্যাধিক ভিড়ের কারণে অনেকের জমিনের উপর সাজদা করার জায়গা মিলত না। (আবু দাউদ)

উল্লেখিত প্রথম হাদিস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলে করিম (সাঃ) এ সাজদা মক্কা বিজয়ের দিন করেছিলেন এবং তা নামাযের বাইরেই করেছিলেন। কেননা একমাত্র ভয়ের নামায ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ফরয নামায আরোহী অবস্থায় জায়েয নয়। তা ছাড়া এটাও বুঝা গেল যে রাসুলে করিম (সাঃ) কয়েক হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে এ সাজদা করেছিলেন। এমনকি অত্যাধিক ভিড়ের কারণে যারা আরোহী ছিলেন তাঁরা নীচে নেমে সাজদা করার জায়গা পাননি। অবস্থা সামনে রেখে কোন সুস্থবুদ্ধি এটা গ্রহণ করতে পারে না যে, এ সমস্ত হাজার হাজার লোক যুদ্ধের ময়দানে প্রথম থেকেই অযু সহকারে ছিলেন। সুতরাং এটা মানতেই হবে যে, কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম বিনা অযুতে এ সাজদা করেছিলেন। আর বিনা অযুতে সাজদায়ে তেলাওয়াত জায়েয ছিল বলেই তাঁরা এরূপ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হাদিস দ্বারাও পরিষ্কার বুঝা গেল, এ সাজদা নামাযের বাইরে ছিল। এবং মানুষ এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, ভিড়ের কারণে অনেকে মাটিতে মাথা রাখার সুযোগ পান নাই। নামাযের বাইরে এতসব মানুষ অযু সহকারে ছিল বলে মনে করা যায় না। সুতরাং এটা বলতেই হবে যে, কেউ কেউ বিনা অযুতে এ সাজদা করেছিলেন। আর এরূপ জায়েয ছিল বলেই তাঁরা করেছিলেন।

عن ابن عباس رض ان النبی صلی الله علیه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس -

(بخاری ج ۹ باب سجود المسلمین مع المشرکین)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (সাঃ) সূরা নাজমে সাজদা করলেন এবং তার সাথে মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন এবং ইনসান সবাই সাজদা করল।

(বোখারী ১ম খণ্ড, মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সাজদা অধ্যায়)

ইমাম বোখারী এ হাদিসের অনুচ্ছেদে লেখেন ঃ

والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رض يسجد على غير وضوء

মুশরিকরা নাপাক, তাদের অযুর কোন অর্থ হয় না এবং ইবনে উমর (রাঃ) বিনা অযুতে সাজদা করতেন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানীর অভিমত

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিনা অযুতে তিলাওয়াতের সাজদা করতেন।

এ বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আ'ইনী ও হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী বলেন ঃ

هكذا فى رواية الاكثرين وللاصيلى بحذف "غير" هذا هو اللائق بحاله لانه لم يوافقه احد على جواز السجود بغير وضوء الا الشعبى رح ولكن الاصح اثباته لما روى ابن ابى شيبة كان ابن عمر رض ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجدو ما يتوضأ واماماروى البيهقى باسناد عن ابن عمر انه قال لايسجد الرجل الاوهوطاهرفيجمع بينهما بانه اراد بقوله وهو طاهر للطهارة الكبرى اويكون هذا على حالة الاختيار وذالك على حالة الضرورة -

(فتح البارى - ج ٢ ص ٣ ٤٤)

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনায় غير (বিনা) শব্দটি রয়েছে। তবে শুধুমাত্র উছাইলীর বর্ণনায় غير (বিনা) শব্দটি নেই। ইবনে উমরের মর্যাদার সাথে উছাইলীর বর্ণনা সামঞ্জস্যশীল। কেননা ইমাম শাবী ব্যতীত অন্য কেউ বিনা অযুতে সাজদায়ে তেলাওয়াত জায়েয হওয়ার বর্ণনার সাথে একমত হন নাই। কিন্তু غير (বিনা) শব্দসহ যে বর্ণনাটি এসেছে তাই সহীহ। কেননা ইবনে আবি

শাইবা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) পেশাব করার জন্য সওয়ারী হতে নিচে নামতেন। অতঃপর পেশাব করে পুনরায় বাহনে চড়তেন এবং সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন ও বিনা অযুতেই সাজদা দিতেন।

তবে অপর দিকে বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে যে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন– 'কোন ব্যক্তি যেন পবিত্রতা ব্যতীত সাজদা না করে।'

এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বায়হাকীর বর্ণনা বড় ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা সেটা সুবিধাজনক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাটি জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(ফতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ–৪৪৩)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম আইনী ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী এ ব্যাপারে একমত যে, ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত বিপরীতমুখী দু'টি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বিনা অযুতে সাজদার হাদিসটিকে যথাস্থানে রেখে অপর হাদিসটির (যাতে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ রয়েছে) জবাব দিয়েছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা ইবনে উমরের বিনা অযুতে সাজদা দেয়ার বর্ণনাটিকে যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশমিরী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা

واما سجدة التلاوة فقال الشعبى رح والبخارى رح لايشترط المتوصى كما اخرج البخارى عن ابن عمر رضـ انه كان يسجد على غير وضوء - (عرف الشذى - ج اص ٨)

তিলাওয়াতের সাজদার জন্য ইমাম বোখারী ও ইমাম শাবীর নিকট অযু শর্ত নয়। যেহেতু ইমাম বোখারী এ উদ্দেশ্যেই ইবনে উমর (রাঃ)-এর আছর বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিনা অযুতেই তিলাওয়াতের সাজদা আদায় করতেন।

(আরফুশশাজী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৮)

হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা

হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন ঃ

ان يبعد فى العادة ان يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الاية على وضوء لانهم لم يتأهبوا لذلك - اذاكان كذلك فمن بادرمنهم السجود خوف الفوات بلا وضوء واقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذالك استدل بذالك على جوازالسجود عندالمشتة بلاوضوء ويؤيده ان لفظ المتن "وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس" فسوى ابن عباس (رضـ) فى نسبة السجودين الجميع وفيهم من لايصح منه الوضوء فيلزم ان يصح السجودممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء -

(فتح البارى - ٢ ص ٤٤٣)

এটা যুক্তির বাইরে যে, 'সাজদার' আয়াত তেলাওয়াতের সময় যে সমস্ত মুসলমান ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই অযু সহকারে ছিলেন। কেননা তাঁরা প্রথম থেকে এর কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সাজদা হারানোর ভয়ে বিনা অযুতে সাজদা করেন এবং রাসূলে করিম (সাঃ) তাঁদেরকে নিষেধ করে নাই। সুতরাং এর দ্বারা এ কথার উপর দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে যে,অসুবিধাবশতঃ এ সাজদা বিনা অযুতে জায়েয আছে। এর সামঞ্জস্য এ কথা দ্বারা হয় যে, হাদিসের মূল ভাষ্যে এ কথা পরিষ্কারভাবে আছে, রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সঙ্গে মুসলমান, মুশরিক, জিন এবং ইনসান সবাই সাজদা করে। অতএব ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবার ব্যাপারে সমানভাবে সাজদার হুকুম দিয়ে দেন। অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাঁদের অযু ছিল না। এ জন্য এটা বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এ সাজদা যাঁদের অযু আছে এবং যাঁদের অযু নেই, সবার জন্য জায়েয। (ফতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৪৪৩)

ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর অভিমত

ليس فى احاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار ان يكون المساجد متوضأ - وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضرتلاوته، ولم ينقل انه امراحدا منهم بالوضوء، ويبعد ان يكونوا جميعا متوضئين - وايضاً قد كان يسجد معه المشركون كماتقدم وهم انجاس لا يصحوئهم - وقدروى البخارى عن ابن عمر انه كان يسجد على غيروضوءوكذالك روى عنه ابن ابى شيبة - واما مارواه البيهقى عنه باسناد قال فى الفتح : صحيح انه قال لايسجد الرجل الاوهو طاهر . فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى او على حالة الاختيار - والاول على الضرورة وهكذا ليس فى الاحاديث مايدل على اعتبار - طهارة الثياب والمكان واما سترالعورة والاستقبال مع الامكان فقيل انه معتبر اتفاقا قال فى الفتح لم يوافق ابن عمراحد على جواز السجود بلا وضوء الا الشعبى اخرجه ابن ابى شيبة عنه بسند صحيح - واخرج ايضا عن ابى عبد الرحمن السلمى انه كان يقرآ بالسجدة ثم يسجد وهو على غير وضوءالى غير القبلة وهو يمشى يؤمى ايماءومن الموافقين لابن عمر من اهل البيت ابو طالب والمنصور بالله - (نيل الاوطار - ج ٣ ص ١١٩)

তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে সাজদাকারীর অযু থাকা বাঞ্ছনীয় বলে কোন প্রমাণ নেই। রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সাথে তিলাওয়াতে উপস্থিত সকল লোকই সাজদা করতেন। অথচ কোথাও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, তিনি কাউকে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া সমস্ত লোক পূর্ব হতেই অযু অবস্থায়ই ছিল তা-ও সুদূর পরাহত। এতদভিন্ন তাঁর সাথে মুশরিকরাও সাজদা করত। অথচ তারা অপবিত্র। তাদের অযু কোন অবস্থাতেই

শুদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত ইমাম বোখারী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিনা অযুতে সাজদা করতেন। ইমাম ইবনে আবি শাইবা ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে তদ্রূপ বর্ণনা করেছেন।

তবে সুনানে বায়হাকীর বর্ণনায় এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে যে, ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি পবিত্রতা ব্যতীত যেন সাজদা না করে। এ দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদিসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বায়হাকীর বর্ণনাটি বড় ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য অথবা সুবিধাজনক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ইবনে আবি শাইবার বর্ণনাটি জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এমনিভাবে হাদিসের মধ্যে কাপড় ও স্থান পবিত্র হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নির্দিষ্ট অঙ্গ ঢাকা এবং কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী বলেন, শাবী ব্যতীত বিনা ওযুতে সাজদা করার ব্যাপারে অন্য কেউ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সাথে একাত্মতা করেন নাই। ইবনে আবি শাইবা সহীহ্ সনদ সহকারে এটা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি আব্দুর রহমান ছোলামী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি পথ চলাকালে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর বিনা অযুতে কিবলামুখী না হয়েই হাঁটা অবস্থায় ইশারার মাধ্যমেই তিনি সাজদা করতেন। আহলে বায়েত থেকে যাঁরা ইবনে উমরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তাঁরা হলেন আবু তালিব ও মনসুর বিল্লাহ। (নাইলুল আওতার, ৩ খণ্ড, পৃঃ-১১৯)

ইমাম কাহলানী (রহঃ)-এর অভিমত

قلت : الاصل انه لايشترط الطهارة الابدليل - وادلة وجوب الطهارة وردت للصلوة - والسجدة لاتسمى صلواة فالدليل على من شرط ذالك - وكذالك اوقات المكراهة ورد النهى عن الصلواة فيها، فلا تشمل السجدة الفردة - وهذا الحديث دل على السجود للتلك وة فى المفصل وياتى الخلاف فى ذالك - ثم رأيت لابن حزم كلاما فى شرح المحلى لفظه " السجود فى قراءة القران ليس ركعة اوركعتين فليس صلواة" واذا كان ليس صلوة فهوجائزبلا وضوء

والتجنب والحائض والى غير القبلة كسائر الذكر - ولا فرق اذا لا يلزم الوضوء الا للصلوة ولم يأت بايجابه لغير الصلواة قران ولا سنة ولا اجماع ولاقياس - فان قيل السجود من الصلواة وبعض الصلواة صلواة - قلنا : والتكبير بعض الصلوة والجلوس والقيام والسلام بعض الصلواة فهل يلتزمون ان لا نفعل احد شيئا من هذه الافعال والاقوال الا وهو على وضوء - هذالايقولونه ولابقوله احد - انتهى - (سبل السلام - ج ١- ص ٢٠٩)

আমি এটাই বলি যে, প্রমাণ ব্যতীত পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা যেতে পারে না। পবিত্রতা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণাদি নামায সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে এবং সাজদাকে নামায বলা হয় না। অতএব যারা সাজদার জন্য তাহারাতের শর্ত আরোপ করেছেন তাদেরকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে। তদ্রূপ মকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু শুধু সাজদা করা এ নিষেধের আওতায় পড়বে না।

ইমাম ইবনে হাজম (রহঃ) বলেছেন, কোরআন তিলাওয়াতের সাজদাকে এক রাকআত কিংবা দু'রাকআত নামায বলা হয় না। অতএব তা নামায নয়। আর যখন তা নামায নয় তখন তা কেবলামুখী হওয়া ব্যতীতই বিনা অযুতে আদায় করা বৈধ। এমনকি অন্যান্য জিকিরের মত তা জুনুবওয়ালা ব্যক্তি এবং মাসিসওয়ালী মহিলার জন্যও বৈধ। এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা শুধু নামাযের জন্য অযুর প্রয়োজন। নামায ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য অযু প্রয়োজন হওয়ার স্বপক্ষে কোরআন, হাদিস, ইজমা এবং কেয়াস হতে কোনই প্রমাণ মেলে না। তবে কেউ যদি বলে যে, সাজদা নামাযের অংশ আর নামাযের অংশকেও নামায বলা হয়।

জবাবে বলবো, তাকবীরও তো নামাযের অংশ। বসা, দাঁড়ান, সালাম ফিরান ইত্যাদিও নামাযের অংশ। এ সমস্ত কাজ, কথা ও উক্তি এককভাবে আদায় করার জন্য অযু করার কোন প্রয়োজন আছে নাকি? এ কথা কোন ওলামা তো দূরের কথা কোন সাধারণ ব্যক্তিও বলেন না। (ছুবুলুচ্ছালা, ১ম খন্ড, ২০৯)

সম্মানিত পাঠক! বিচার করুন মাওলানা মওদূদী উপর আনীত অভিযোগ কি ঠিক? না ভিত্তিহীন একটা অপবাদ মাত্র? মাওলানা মওদূদীর কুফরী করেছেন বলে স্বীকার করে নিলে তো হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ), ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে হাযার, ইমাম শাওকানী, ইমাম কাহলানী এবং মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরীও কুফরী করেছেন বলে স্বীকার করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ!)

مسئلة الخلع

খোলার মাসআলা

খোলা বলা হয় স্ত্রী-স্বামীকে কিছু সম্পদ দিয়ে তার নিকট তালাক আদায় করাকে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) -এর বক্তব্য

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সূরা বাকারার ২২৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

خلع کی صورت میں عدت صرف ایک حیض هے دراصل یه عدت هے ہی نہیں بلکه یه حکم محض استبراء رحم کیلئے دیاگیا هے - تاکه دوسرا نکاح کرنے ے سے پہلے اس امرکا اطمینان حاصل هو جائے که عورت حامله نہیں هے - (تفہیم القرآن جـ١)

খোলা তালাকের পর স্ত্রীলোকটির জন্য ইদ্দৎ মাত্র এক হায়েজ বা এক ঋতুকাল। মূলত এটা কোন ইদ্দত নহে, বরং স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী কি না তা যাচাই করার জন্যই এ ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন পুনরায় অন্যত্র বিয়ের হওয়ার পূর্বে স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী না হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

(তাফহীমুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

মাওলানা তাঁর حقوق الزوجين বা' স্বামী-স্ত্রীর অধিকার' নামক বইয়ে এ প্রসঙ্গে আরও বলেন ঃ

جس طرح مردکوقانونی طور پر طلاق دینے کاحق شریعت نے دیاهے اور عورت کی رضامندی کے بغیر مرد اپنایه حق استعمال کرسکتا هے - اسی طرح عورت کو بهی شریعت نے خلع کا حق دے رکها هے - اور مردکی رضامندی کے بغیر عدالت عورت کو یه حق دلواسکتی هے - (حقوق الزوجين)

ইসলামী শরীয়ত পুরুষকে যেমন তালাক দেয়ার আইনগত অধিকার দিয়েছে এবং সে তার এ অধিকার স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত প্রয়োগ করতে পারে ঠিক তেমনি স্ত্রীকেও খোলা করার অধিকার দিয়েছে। পুরুষের সম্মতি ব্যতীত আদালত তার এ অধিকার আদায় করে দিতে পারে।

মাওলানার এ দুটি বক্তব্য থেকে যে দু'টি কথা পরিষ্কার হয় তা হচ্ছে ঃ

১) খোলাপ্রাপ্তা মেয়েলোকের ইদ্দত এক হায়েজ।

২) পুরুষকে যেমন স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তালাক দেবার অধিকার শরীয়ত দিয়েছে, ঠিক তেমনি পুরুষের সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীকে খোলা করার অধিকার দিয়েছে।

এ দুটি কথাকে মাওলানার বিরোধীরা কোরআন ও হাদিসের হুকুমের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, যে এরূপ কথায় বিশ্বাসী সে পথভ্রষ্ট ও কোরআন-হাদিস অস্বীকারকারী।

পাঠকবন্দ! এবার আসুন আমরা মাওলানার কথা দুটোকে কোরআন-হাদিস ও ওলামায়ে কিরামের অভিমতের সাথে মিলিয়ে দেখি সত্যিই কি তিনি পথভ্রষ্ট এবং কোরআন হাদিস অস্বীকারকারী?

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সময় থেকেই এ ব্যাপারে মতবিরোধ চলে আসছে। একদিকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীনদের এক বিরাট জামায়াতের মত হল, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ তিন হায়েজ। অন্যদিকে তাঁদেরই এক উল্লেখযোগ্য জামায়াতের মত হল ইদ্দৎ এক হায়েজ।

ইমাম তিরমিজী এ মতবিরোধ সম্পর্কে বলেন ঃ

واختلف اهل العلم فى عدة المختلعة فقال اكثر اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عدة المختلعة عدة المطاقة وهو قول الثورى واهل الكوفة وبه يقول احمدواسحق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة واحدة - قال اسحق وان ذهب الى هذا ذاهب فهو مذهب قوى - (ترمذى - باب ما جاءفى الخلع)

ওলামায়ে কেরাম খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দতের ব্যাপারে একমত নহেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমাম ছাওরী, ইমাম আহমদ, ইমান ইসহাক ও কুফাবাসীদের মত হল, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের মত তিন হায়েজ।

অন্যদিকে সাহাবায়ে কিরামের এক উল্লেখযোগ্য জামায়াতের মত হল খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ এক হায়েজ।

ইমাম ইসহাক বলেন, কেউ যদি এ মত (ইদ্দৎ এক হায়েজ)-কে গ্রহণ করে তাহলে দলিলের দিক দিয়ে এটাই শক্তিশালী। (তিরমিজী, খোলা অধ্যায়)

হাফিজ ইবনে কাইয়ুম (রহঃ)-এর অভিমত

ان الشارع جعل عدة المختلعة حيضة كما ثبتت به السنة واقربه عثمان رض وابن عباس رض وابن عمر رض وحكاه ابن جعفر النحاس فى ناسخه ومنسوخه اجماع الصحابة وهو مذهب اسحق و احمد بن حنبل فى اصح الرواتين عنه دليلا -

(زاد المعاد - ج ٤ ص ٣٠٤)

আল্লাহ ও রাসূল খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ এক হায়েজই নির্ধারিত করেছেন যেটা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উসমান এবং ইবনে উমর (রাঃ)-ও এটা স্বীকার করেছেন। ইবনে জাফর তাঁর 'নাসিখ ও মানসুখ' –এর উপর সাহাবাদের ঐক্যমত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইসহাক ও ইমাম আহমদেরও মত এটাই। তাছাড়া এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, দলিলের দিক দিয়ে এটাই সবচেয়ে সঠিক মত।

(যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা –৩০৪)

তিনি আরও বলেন ঃ

وذهب الى هذا المذهب اسحق بن راهو يه والامام احمد فى رواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله وقال من نظر الى هذا القول وجده مقتضى قواعدالشرعية - (زاد المعاد - ج ٤)

এটাই ইমাম ইসহাকের মাযহাব। এবং একবর্ণনা মতে ইমাম আহমদেরও মাযহাব এটা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ মাযহাবকেই গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি এ মতের উপর চিন্তা করবে সে এটাকে শরীয়তের সঠিক দাবী অনুযায়ী পাবে। (জাদুল মা'আদ,৪র্থ খণ্ড)

তিন হায়েজের দাবিদারদের দলিল

তাঁরা বলেন, শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে 'খোলা' তালাকের মতই। আর কোরআন শরীফ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ তিন হায়েজ ঘোষণা করেছে।

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء -

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক অন্য বিয়ের জন্য যেন তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে।'

সুতরাং খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দৎ ও তিন হায়েজ।

এক হায়েজের দাবিদারদের দলিল

তারা নিম্নলিখিত হাদিসগুলো দলিল হিসেবে পেশ করেন ঃ

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضة -

(ترمذی - ج ا ص ١٤٢)

রোবাই বিনতে মুয়াববেয বিন আফরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করিম (সাঃ)-এর জামানায় তার স্বামী থেকে খোলা লাভ করেন এবং রাসূলে করিম (সাঃ) তাকে ইদ্দৎ হিসেবে এক হায়েজ অতিবাহিত করার আদেশ দেন।

(তিরমিজী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪২)

عن ابن عباس رضـ ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت عن زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة - (ترمذی - ج ا ص ١٤٢)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী রাসূলে করিম (সাঃ) এর জামানায় তার স্বামী থেকে খোলা লাভ করেন। অতঃপর রাসূলে করিম (সাঃ) তাকে ইদ্দৎ হিসেবে এক হায়েজ অতিবাহিত করার নির্দেশ দেন। (তিরমিজী, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা -১৪২)

عن نافع عن ابن عمر رضـ انه قال عدة المختلعة حيضة -
(ابو داود - ج ا ص ۳۰۳)

হযরত নাফে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) খোলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দৎ এক হায়েজ বলেছেন।

(আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৩০৩)

روى الليث بن سعدعن نافع انه سمع الربيع بنت معوذبن عفراء وهى تخبر عبد الله بن عمر رضـ انها اختلعت من زوجها فى عهد عثمان بن عفان فجاء عمها الى عثمان فقال ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل ؟ فقال عثمان لتنتقل ولاميراث بينهما ولا عدة عليها الا انها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية ان يكون بها حبل فقال عبد الله عثمان رضـ خيرنا واعلمنا - (زاد المعاد - ج ٤ص ٥٠)

লাইছ ইবনে সাদ হযরত নাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে রোবাই বিনতে মুয়াববেয বিন আফরাকে বলতে শুনেছেন, রোবাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে তার খোলার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করতে ছিলেন যে, যখন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর জামানায় তার স্বামী থেকে খোলা লাভ করেন তখন তার চাচা হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন- 'রোবাই আজ তার স্বামী থেকে খোলা নিয়েছে। সে কি তার ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে?'

হযরত উসমান বললেন, যেতে পারে এবং কেউ কারো কাছ থেকে কোন মিরাস লাভ করতে পারবে না এবং রোবাইর উপর কোন ইদ্দৎও নেই। হ্যাঁ, এক হায়েজ না আসা পর্যন্ত সে অন্য বিয়ে করতে পারবে না এ সন্দেহে যে, হয়ত সে গর্ভবতী।

ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, উসমান (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও জ্ঞানী। (যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-৫০)

عن عبادة بن الوليدقال قلت للربيع بنت معوذحدثينى حديثك قالت اختلعت من زوجى ثم جئت عثمان رض فسألت ماذا على من العدة قال لا عدة عليك ان يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضين حيضة قالت وانما يتبع فى ذالك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه - (زاد المعاد - ج ٤ ص ٣٠٨)

উবাদা বিন ওলিদ বর্ণনা করেন যে, আমি নিজে রোবাই বিনতে মুয়াববেয তার খোলার ঘটনা বর্ণনা করতে বললাম।

রোবাই বললেন, আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে খোলা লাভ করে হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার উপর কি ইদ্দৎ রয়েছে?

তিনি বললেন, তোমার উপর কোন ইদ্দৎ নেই। হ্যাঁ, নিকটবর্তী সময়ে তোমার সাথে যদি সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য তুমি এক হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

রোবাই (রাঃ) বলেন, হযরত উসান (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলে করিম (সাঃ)-এর ফয়সালার অনুসরণ করতেন। এ রকম ফয়সালা তিনি সাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী মরিয়মের ব্যাপারেও করেছিলেন যখন তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা লাভ করেন। (যাদুল মা'আদ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-৩০৮)

ইমাম নাসায়ী ও রোবাই বিনতে মুয়াববেষের খোলার ঘটনা বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

فامر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة واحدة وتلحق باهلها - (زاد المعاد - ج ٤ ص ٤٨)

অতঃপর তাঁকে (রোবাই) রাসূলে করিম (সাঃ) এক ইদ্দৎ হিসেবে পালনের এবং নিজ আত্মীয়দের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

(যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-৪৮)

তা ছাড়া এক হায়েজের দাবিদাররা আরও যুক্তিগত দলিল পেশ করেন চার মাযহাবের চার ইমামই এ কথার উপর ঐক্যবদ্ধ যে, খোলার মধ্যে স্বামীর رجوع বা প্রত্যাবর্তনের কোন অধিকার নেই। খোলা করার সাথে সাথে স্ত্রী বিয়ের বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যাবে। হাফিজ ইবনে কাইয়ুম এ সম্পর্কে বলেন ঃ

فاذا تقابلا الخلع ورو عليها ما اخذمنها وارتجعها فى العدة فهل لهما ذالك ؟ منعه الائمة الاربعة وغيرهم وقالوا قدبانت منه بنفس الخلع -

যদি স্বামী থেকে স্ত্রী খোলা করে এবং স্বামী খোলার বদলে যে মাল পেয়েছিল তা স্ত্রীকে ফেরত দিয়ে ইদ্দতের ভেতর সে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাহলে এরূপ করা কি জায়েয হবে ? চার ইমাম ও অন্যান্যরা প্রত্যাহার করাকে নিষেধ করেছেন। তারা বলেন, স্ত্রী খোলা করলেই স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

যেহেতু চার ইমামেরই ঐক্যমতে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের কোন অধিকার নেই, সুতরাং খোলার ইদ্দত তিন হায়েজের পরিবর্তে এক হায়েজ এ কারণে হওয়া উচিত যে, শরীয়ত তালাকের ইদ্দৎ তিন হায়েজ নির্ধারিত করেছে এ জন্য, যাতে স্বামী এ দীর্ঘ সময়ে চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং যদি সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তাহলে ইদ্দতের ভিতর তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু খোলার মধ্যে যখন মূলত প্রত্যাবর্তনের কোন অধিকারই নেই এবং এতে ইদ্দৎ এ জন্য রাখা হয়নি যাতে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সুযোগ মেলে। বরং ইদ্দত এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে গর্ভবতী কি না তা প্রকাশ পায়। আর এ উদ্দেশ্য এক হায়েজ দ্বারাই পূর্ণ হয় তাই তিন হায়েজ নিরর্থক। এটা ঐ দলিল যেটাকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) পেশ করেছেন। হাফিজ ইবনে কাইয়ুম (রহঃ) এটাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وذهب الى هذ المذهب الامام احمد و فيرواية عنه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال من نظر الى هذا المذهب وجده مقتضى قواعد الشرعية فان العدة انما جعل ثلث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فالمقصودمجرد براءة رحمها من الحمل وذالك يكفى فيه حيضة واحدة كالاستبراء - (زادالمعاد - ج ٤ صفـ ٥١)

এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদেরও মাযহাব এটি এবং এ মাযহাবকেই শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া গ্রহণ করে বলেন ঃ

যে ব্যক্তি এটাকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে, শরীয়তের আইনের চাহিদানুসারেই এটাকে পাবে। কেননা তিন হায়েজ পর্যন্ত ইদ্দৎ এ জন্য বাড়ানো হয়েছে যাতে প্রত্যাবর্তন করার সময় লম্বা হয় এবং স্বামী এ ব্যাপারে চিন্তা করে ইদ্দতের ভিতরেই প্রত্যাবর্তনের উপর সক্ষম হয়। খোলার মধ্যে ইদ্দতের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটিই যে, গর্ভ কি না তা যেন প্রকাশ পায়। আর এ উদ্দেশ্যের জন্য এক হায়েজই যথেষ্ট। (যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-৫১)

স্বামীর সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীর খোলার অধিকার

এটিও একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মাযহাব হল স্বামীর সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীর খোলা করার কোন অধিকার নেই এবং কোন হাকিম বা কাজীও স্ত্রীর এ অধিকার আদায় করে দিতে পারবে না। খোলা একমাত্র স্বামীর সম্মতির উপরই নির্ভর করে নতুবা নয়। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম আওজায়ী এবং ইমাম ইসহাক ভিন্নমত পোষণ করেন।

ইমাম মালিক, ইমাম আওজায়ী ও ইমাম ইসহাকের অভিমত

তাঁদের অভিমত হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

قال ابن بطال اجمع العلماء على ان المخاطب بقوله تعالى "وان خفتم شقاق بينهما" الحكام - وان المراد بقوله "يريد اصلاحًا" الحكمان وان المحكمين يكون احدهما من جهة الرجل والاخرمن جهة المرأة - وانهما اذا اختلفا لم ينفذ قولهما - وان اتفقا نفذ فى الجمع بينهما من غير توكيل - واختلفوا فيما اذا اتفقوا على الفرقة فقال مالك رح والاوزاعى واسحق ينفذ بغير توكيل ولا اذن من الزوجين وقال الكوفيون والشافعى واحمد يحتاجان الي الاذن فاما مالك رح ومن تابعه فالحقوه بالعنين والمولى- فان الحاكم يطلق عليهمافكذالك هذا - وايضا فلما

كان المخاطب بذالك الحكام وان الارسال اليهم دليل على ان بلوغ الغاية من الجمع والتفريق اليهم وجري الباقون على الاصل وهوان الطلاق بيد الروج فان اذن فى ذالك والاطلق عليه الحاكم -

(فتح البارى - ج ٩ صف ٣٣٢)

ইবনে বাত্তাল বলেন, ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর ঐক্যবদ্ধ যে, আল্লাহ তায়ালার আয়াত خفتم -এর মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন হাকিমগণ। এবং ان يريدا اصلاحا -এর অর্থ উভয় পক্ষের হাকিমরা। একজন হবেন স্বামীর পক্ষ থেকে আর অন্যজন হবেন স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

এ কথার উপরও ওলামায়ে কেরাম একমত যে, উভয় পক্ষের হাকিম যদি ভিন্নমত পোষণ করেন, তাহলে কারো ফয়সালা গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রীকে মিলিত রাখার ব্যাপারে তারা যদি ঐক্যমত পোষণ করেন তাহলে তাদের ফয়সালা গ্রহণ করা হবে যদিও স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদেরকে এ ব্যাপারে উকিল না বানিয়ে থাকেন। ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন উভয় পক্ষের হাকিম তাদেরকে পৃথক করে দিতে সম্মত হয়ে যান।

ইমাম মালিক, ইমাম আওজায়ী এবং ইমাম ইসহাক বলেন, পৃথক করার বেলায়ও হাকিমগণের ফয়সালা গ্রহণযোগ্য যদিও স্বামী-স্ত্রী তাদের হাকিম না বানিয়ে থাকেন এবং না তাদের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি পেয়ে থাকেন।

কুফাবাসী এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, হাকিমগণ স্বামী-স্ত্রীর অনুমতির মুখাপেক্ষী হবেন। ইমাম মালিক এবং তাঁর অনুসারী ওলামায়ে কেরাম এ দলিল পেশ করেন যে, এ স্বামী ঐ স্বামীর মত যে পুরষত্বহীন কিংবা স্ত্রীর সাথে ঈলা করে বসেছে। তাদের বিয়ে ভঙ্গ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও তাই করতে পারবেন।

অন্য দলিল তারা পেশ করেন যে, خفتم শব্দে যখন সম্বোধিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন হাকিমগণ, যাদেরকে স্বামী-স্ত্রী পাঠিয়েছেন। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীকে মিলিত অথবা পৃথক করার ক্ষমতাও তাদের আছে।

তাদের ছাড়া অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম তাদের মাযহাবকে আসলের উপর স্থাপন করে বলেছেন, তালাক সম্পূর্ণ স্বামীর অধিকারে। যদি এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী অনুমতি দেয় তা ভাল কথা। নতুবা হাকিম শক্তি প্রয়োগ করে স্বামীর কাছ থেকে তালাক আদায় করবে। (ফতহুল বারী, নবম খণ্ড, পৃঃ -৩৩২)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইমাম মালিক, আওজায়ী ও ইমাম ইসহাকের মতানুসারে স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীতও হাকিম তাদের বিয়ে ভঙ্গ করতে পারেন। খোলার বেলায়ও স্ত্রী যদি স্বামীর অসম্মতিতে আদালতে খোলার আবেদন করেন, তাহলে হাকিম তাদেরকে পৃথক করে দেবেন।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) একই কথা বলেছেন। কিন্তু কোরআন-হাদিস অস্বীকার করার ফতোয়া একমাত্র তাঁরই ভাগ্যে জুটেছে। ন্যায় বিচার অনুযায়ী তো ইমাম মালিক, ইমাম আওজায়ী ও ইমাম ইসহাকও এ ফতোয়ার আওতায় পড়েন। কিন্তু তথাকথিত মুফতীরা কি পারবে তাঁদের বেলায় ঐ ফতোয়া দিতে? দিলে তো তাদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। হ্যাঁ, কেউ বলতে পারেন যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে কেন অন্য মাযহাবের ইমামদের মতকে গ্রহণ করলেন? এটা তাকলীদের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, কোরআন-হাদিসের শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে যে কেউ নিজ মাযহাবের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। মাওলানা তাকলীদ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন ঃ

আমি প্রকৃত পক্ষে সেই ইমামের অনুসারী যাঁর নাম মোহাম্মদ (সাঃ) হ্যাঁ, ফেকহী মাসআলায় আমার রীতি হলো, যে মাসআলায় আমি তাহকীক বা অনুসন্ধানের সুযোগ না পাই, এতে আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অনুসরণ করি। কেননা তাঁর মাযহাবের অধিকাংশ মাসআলা আমার প্রকৃত ইমামের শিক্ষার অধিক অনুকূলে পেয়েছি। কিন্তু যে মাসআলায় আমার অনুসন্ধানের সুযোগ মেলে তাতে আমি চার ইমামের মাযহাবের উপর দৃষ্টি দেই এবং যেটাকে কোরআন-হাদিসের উদ্দেশ্যের অধিক নিকটবর্তী পাই এটারই অনুসরণ করি।

বস্তুতঃ মাওলানা খোলার ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতেই করেছেন। নিম্নে তার কিয়দাংশ লিপিবদ্ধ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানার "حقوق الزوجين" স্বামী-স্ত্রীর অধিকার' নামক বই পড়তে পারেন।

স্ত্রীর খোলার অধিকার সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর আলোচনা

ইসলামী বিধান যেরূপ পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে অপছন্দ করবে কিংবা যার সঙ্গে কোন রকমেই বসবাস করা সম্ভব নয় মনে করে তাকে তালাক দিতে পারে অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও অধিকার দেয়া হয়েছে, সে যে পুরুষকে

অপছন্দ করে এবং কোন মতেই যার সাথে বসবাস সম্ভব নয় তখন সে খোলা নিতে পারে। এ পর্যায়ে শরীয়তের বিধানের দু'টি দিক রয়েছে, নৈতিক ও আইনগত।

নৈতিক দিক হচ্ছে এই যে, পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী। প্রত্যেককে তালাক অথবা খোলার ক্ষমতা শুধু অনন্যোপায় অবস্থায় ব্যবহার করা উচিৎ, শুধু মানসিক তৃপ্তির জন্য তালাক এবং খোলাকে যেন তামাশা না বানানো হয়। এ ব্যাপারে নবী করিম (সাঃ)-এর এরশাদ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان الله لايحب الذواقين والذواقات -

স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষণকারিণীদেরকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

لعن الله كل ذواق مطلاق -

প্রত্যেক স্বাদ অন্বেষণকারী ও অধিক তালাক ব্যবহারকারীর উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।

ايما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . المختلعت هن المنافقات .

যে নারী তার স্বামীর ত্রুটি ব্যতিরেকে খোলা করে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত। খোলা তামাশায় পরিণতকারিণী মুনাফেক।

আইনগত দিকের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ করা, তা নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না, বরং পুরুষকে স্বামী হওয়ার প্রেক্ষিতে যেমন তালাকের অধিকার দেয় অনুরূপভাবে স্ত্রী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে খোলা করার ক্ষমতা দেয়, যেন উভয়ের জন্য প্রয়োজন বোধে বিয়েবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয়। এবং কোন পক্ষ এমন অবস্থায় পতিত না হয় যে, অন্তরে ঘৃণা বিদ্যমান আবার বিয়ের উদ্দেশ্যসমূহও পূর্ণ হচ্ছে না, দাম্পত্য সম্পর্ক একটা বিপদ হয়ে আছে, অথচ অগত্যা পরস্পর কেবল এ কারণেই একে অপরের সাথে বেঁধে আছে যে, সে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার কোন উপায় নেই।

উভয়ের মধ্যে কোন একজন যদি নিজ ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে তাহলে সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এমন কাজ করলে আইন তার প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গত শর্তাবলী আরোপ করবে। কিন্তু ন্যায় অথবা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা ব্যবহার

করার সীমানা নির্ধারণ নির্ভর করে অনেকটা স্বয়ং সে ক্ষমতা ব্যবহারকারীর যাচাই ক্ষমতা, তার দ্বীনদারী এবং খোদাভীতির উপর। সে নিজে এবং তার খোদা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এ বিচার করতে পারবে না যে, সে শুধু স্বাদ অন্বেষণকারী না কি বাস্তবিক পক্ষে এ অধিকার ব্যবহার করার তার প্রয়োজন আছে। তাতে তার স্বভাবগত অধিকার দেয়ার পর অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আইন শুধু প্রয়োজনীয় শর্ত তার উপর প্রয়োগ করতে পারে। আপনারা তালাকের আলোচনায় যেমন দেখেছেন যে, পুরুষকে স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার দেয়ার সাথে তার উপর বিভিন্ন শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন সে স্ত্রীকে মোহররূপে যা কিছু দিয়েছে তার ক্ষতি সহ্য করতে হবে, হায়েজের সময় তালাক দিতে পারবে না, ইদ্দতের সময় স্ত্রীকে নিজের ঘরে রাখতে হবে, তিন তোহরের প্রত্যেক তোহরে এক এক তালাক দিতে হবে এবং যখন তিন তালাক দিয়ে বসবে তখন তাহলীল ব্যতীত সে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে খোলার অধিকার দেয়ার সাথে কতগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা কোরআন মজিদে সংক্ষিপ্ত আয়াতে পরিপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছে।

ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدودالله فان خفتم الايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به – (سورة البقرة اية ٢٢٩)

এবং তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা থেকে সামান্য ফেরত নাও। হ্যাঁ, যখন তাদের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমানায় টিকে থাকতে পারবে না, এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী কিছু বিনিময় প্রদান করে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন এতে কোন ক্ষতি বা আপত্তি নেই।

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত – ২২৯)

এ আয়াত থেকে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ পাওয়া যায় ঃ

১) খোলা সে অবস্থায় হতে হবে যখন আল্লাহর সীমানা লংঘিত হওয়ার আশংকা হয়।

فلا جناح عليهما –

এর শাব্দিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, যদিও খোলা একটি মন্দ বস্তু যেমন তালাক একটি মন্দ বস্তু, কিন্তু যখন এ আশংকা হয় যে, আল্লাহর সীমানা লংঘিত হতে পারে তখন খোলা করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই।

২) যখন স্ত্রী বিয়ে বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করে তখন তাকেও অনুরূপভাবে অর্থ বিসর্জন দেয়াকে মেনে নিতে হবে, যেরূপভাবে স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সবকিছু ফেরত নিতে পারবে না যা অর্থের আকারে মোহরস্বরূপ স্ত্রীকে প্রদান করেছিল। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী বিচ্ছেদের কামনা করে তাহলে সে স্বামীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিল তার একাংশ অথবা সম্পূর্ণ ফেরত দিয়েই বিচ্ছেদ ঘটাবে।

৩) অর্থ বিনিময় প্রদান করে মুক্তি লাভ করা। এর জন্য শুধু বিনিময় প্রদানকারীর ইচ্ছেই যথেষ্ট নয়, বরং এর পরিপূর্ণতা তখনই হবে যখন বিনিময় গ্রহণকারীও সম্মত হবে। উদ্দেশ্য হল স্ত্রী শুধু কিছু পরিমাণ অর্থ পেশ করে নিজে নিজেই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না, বরং বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সে যে অর্থ পেশ করেছে স্বামী তা গ্রহণ করে তালাক দেবে।

৪) খোলার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার সম্পূর্ণ মোহর অথবা তার একাংশ পেশ করে বিচ্ছেদ কামনা করবে এবং পুরুষ তা গ্রহণ করে তালাক দিবে।

فلا جناح عليهما فيما افتدت به -

এ আয়াতে শব্দের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, উভয়ের সম্মতি ছাড়াই খোলার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ দ্বারা সে লোকের ধারণার অপনোদন হয়ে যায় যারা খোলার জন্যে আদালতের বিচারকে শর্ত মনে করেন। ইসলাম এ জাতীয় ঘটনাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া আদৌ পছন্দ করে না, ঘরের ভিতরেই যার মীমাংসা হতে পারে।

৫) যদি স্ত্রী ফিদিয়া (মুক্তি বিনিময়) পেশ করে এবং স্বামী তা গ্রহণ না করে, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার আছে। যেমন উপরে উল্লেখিত আয়াত فان خفتم الا يقيما حدود এর শব্দ হতে প্রকাশ পায়। এ আয়াতের মধ্যে خفتم -এর সম্বোধন সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের আমীর ও শাসকদের দিকেই রয়েছে। কেননা আমীর বা শাসকদের সর্বপ্রথম দায়িত্বই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সীমা হেফাজত করা। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে যে, যখন আল্লাহর সীমানা লংঘিত হওয়ার আশংকা প্রকাশ পায় তখন স্ত্রীকে তার অধিকার উসুল করে দেয়া যা রক্ষার জন্যই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আহকাম বা নির্দেশ। এখানে এ কথার ব্যাখ্যা নেই যে, আল্লাহর সীমানা লংঘন হওয়ার আশংকা কোন কোন অবস্থায় সাব্যস্ত হবে। فدية অর্থাৎ মুক্তি বিনিময়ের পরিমাণ করার মধ্যে ইনসাফ কি হবে। এমন যদি হয় যে,

স্ত্রী ফিদিয়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু স্বামী যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে এমতাবস্থায় বিচারকের কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আমরা এ সমস্ত মাসআলা বা সমস্যার বিস্তারিত বর্ণনা খোলার সেসব ভূমিকার বিবরণে জানতে পারি, যা নবী করিম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খোলার উদাহরণসমূহ

যে মোকদ্দমায় হযরত ছাবিত বিন কায়েসের স্ত্রীরা তা থেকে খোলা হাসিল করেছিল তাই হচ্ছে খোলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের বিভিন্নাংশ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সমস্ত অংশগুলোকে একত্রে দেখলে জানা যায়, ছাবিত (রাঃ) থেকে তাঁর দু'স্ত্রীই খোলা হাসিল করেছিলেন। এক স্ত্রী হচ্ছেন জামিলা বিনতে ওবাই বিন সলুল (আব্দুল্লাহ বিন ওবায়ের ভগ্নি)।

সে ঘটনা হচ্ছে এই, ছাবেতের চেহারা-সুরত তাঁর পছন্দ ছিল না। খোলার জন্য তিনি নবী করিম (সাঃ)-এর খেদমতে নালিশ করে এ ভাষায় নিজের অভিযোগ জানালেন ঃ

يارسول الله لايجمع رأسى ورأسه شيئ ابدا - انى رفعت جانب الخباء فرايته اقبل فى عدة نفر فاذا هو اشدهم سوادا وا قصرهم قامة و اقبحهم وجها - (ابن جرير)

হে আল্লাহর রাসূল! আমার ও তাঁর মাথাকে কখনও কোন বস্তু একত্রিত করতে পারবে না। আমি একদিন আবরণ সরিয়ে দেখলাম সে কতকগুলো লোকসহ আমার সামনে আসছে, কিন্তু তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশী কালো, সবচেয়ে বেশী বেঁটে এবং সব চাইতে অধিক কুৎসিত দেখেছি। (ইবনে জারীর)

والله ماكرهت منه دينا ولا خلقا الا انى كرهت ذمامته -
(ابن جرير)

আল্লাহর শপথ! আমি তার দ্বীন ও নৈতিকতার কোন ক্রটির জন্য তাকে অপছন্দ করছি না, বরং তার কুৎসিত চেহারাই আমার কাছে অছন্দনীয়। (ইবনে জারীর)

والله لولامخافة الله اذا دخل على لبصقت فى وجهه -
(ابن جرير)

আল্লাহর শপথ! যদি খোদার ভয় না থাকত, তাহলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তার মুখে থুথু দিতাম। (ইবনে জারীর)

يارسول الله بى من الجمال ماترى وثبت رجل ميم -
(عبد الرزاق بحوالة فتح البارى)

হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেরূপ সুন্দরী ও সুশ্রী তা আপনি দেখছেন এবং ছাবিত হচ্ছে এক কুৎসিত ব্যক্তি। (ফতহুল বারীর হাওয়ালায় আব্দুর রাজ্জাক)

وما اعتب عليه فى خلق ولادين ولكنى اكره الكفرفى الاسلام -
(بخارى)

আমি তার দ্বীন ও নৈতিকতার উপর কোন অভিযোগ করছি না। কিন্তু ইসলামের মধ্যে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে। (বুখারী)

নবী করিম (সাঃ) অভিযোগ শুনে বললেন ঃ

اتردين عليه حديقته التى اعطاك؟

সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তা ফেরত দেবে ?

উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল। বরং যদি সে আরও অধিক কিছু চায় তাহলে আমি অধিকও দেব।

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ اما الزيادة فلا ولكن حديقته

অধিক কিছু নয়, তুমি কেবল তার বাগানটিই ফেরত দিয়ে দাও।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) ছাবিতকে বললেন ঃ

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة -

তোমার বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে মাত্র এক তালাক দাও।

হযরত ছাবিতের আরও এক স্ত্রী ছিলেন হাবিবা বিনতে সহল আল আনছারিয়াহ। তার ঘটনা ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু দাউদ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন প্রাতঃকালে রাসূল (সাঃ) ঘর থেকে বের হতেই হাবিবাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি?

উত্তর পেলেন ঃ لا انا ولا ثابت بن قيس ـ

আমারও ছাবিত বিন কায়েসের মধ্যে মিলমিশ হবে না।

যখন ছাবিত উপস্থিত হলেন তখন নবী (সাঃ) বললেন, দেখো এ হচ্ছে হাবিবা বিনতে সহল।

এরপর ছাবিত বললেন, আল্লাহ যা কিছু চান সে বলতে থাকুক।

অতঃপর হাবিবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছাবেত আমাকে যা কিছু দিয়েছে ওগুলো সব আমার কাছে আছে।

নবী করিম (সাঃ) ছাবিতকে আদেশ দিলেন, সে সব কিছু তুমি নিয়ে যাও এবং তাকে বিদায় করে দাও।

কোন হাদিসে خل سبيلها শব্দ এবং কোন হাদিসে فارقها রয়েছে। কিন্তু উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে একই। আবু দাউদ ও ইবনে জারির হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ছাবিত হাবিবাকে এমনভাবে মার দিয়েছিলেন যার ফলে তার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাবিবা এসে নবী (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি ছাবিতকে আদেশ দিলেন ঃ

خذ بعض ما لها وفارقها

তার সম্পদের একাংশ নিয়ে নাও এবং তাকে পৃথক করে দাও।

কিন্তু ইবনে মাজাহ হাবিবার যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, ছাবিতের বিরুদ্ধে হাবিবার যে অভিযোগ ছিল তা মারধরের নয় বরং তা ছিল কুৎসিত আকৃতির। সুতরাং সে ওই শব্দগুলোই বলেছে যা অন্যান্য হাদিসে জামিলাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যদি আল্লাহর ভয় না হত তাহলে আমি ছাবেতির মুখে থুথু দিতাম।

হযরত উমর (রাঃ)-এর সম্মুখে এক নারী ও এক পুরুষের মোকদ্দমা পেশ করা হয়। তিনি স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে স্বামীর সাথে বসবাস করার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু স্ত্রী তা গ্রহণ করেনি। অতঃপর তিনি উক্ত নারীকে এমন এক কোঠায় আবদ্ধ করেছিলেন যা খড়কুটায় পরিপূর্ণ ছিল।

তিন দিন আবদ্ধ রাখার পর তাকে বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কি মত?

সে বললো, আল্লাহর শপথ! এ রাতগুলোতেই আমার কিছু শান্তি জুটেছে।

এ কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) তার স্বামীকে আদেশ দিলেন ঃ

اخلعها ويحك ولو من قرطها -

কানের বালির মতো সামান্য অলংকারের বিনিময় হলেও একে খোলা দিয়ে দাও।

রোবাই বিনতে মোয়াববেয বিন আফরা তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে স্বামী সম্মত হয়নি। অতঃপর হযরত উসমানের খেদমতে মোকদ্দমা পেশ করা হলে তিনি স্বামীকে আদেশ করলেন, তার মাথার চুল বাধার ফিতা অথবা তার চেয়ে সামান্য জিনিস নিয়ে হলেও তাকে খোলা দিয়ে দাও।

فاجازه وامره باخذ عقاص رأسها فجادونه -

(ابن سعد بحوالة فتح البارى - ج ٩ . صـ ٣٣٦)

খোলার বিধানসমূহ

১) এসব হাদিস থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যাচ্ছে ঃ

فان خفتم ان لايقيما حدود الله -

এর তাফসীর হচ্ছে সে অভিযোগ যা ছাবিত বিন কায়েসের স্ত্রীদের থেকে পেশ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ যে, তাদের স্বামী দেখতে কুৎসিত এবং সে তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়।

খোলার জন্য নবী করিম (সাঃ) এ অভিযোগকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। নবী (সাঃ) তাদেরকে স্বামীর সৌন্দর্যের উপর কোন দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেননি। কেননা তাঁর দৃষ্টি ছিল শরীয়তের উদ্দেশ্যের উপরই। একবার যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তাদের অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান এ অবস্থায় একজন নারী ও একজন পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে পরস্পর বেঁধে রাখার পরিণাম খারাপ হবে – যা ধর্ম, নৈতিকতা এবং সততার জন্য তালাক ও খোলার চেয়ে অধিকতর মারাত্মক। এ থেকে শরীয়তের উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং নবী করিম (সাঃ) -এর কাছ থেকে এ সূত্র জানা যাচ্ছে যে, খোলার বিধান প্রয়োগ করার জন্য কেবল এ কথা প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার স্বামীকে সত্য সত্যই অপছন্দ করে এবং সে স্বামীর সাথে বসবাস করতে অনিচ্ছুক।

২) হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি যাচাই করার জন্য শরীয়তের বিচারক বা কাজী কোন উপযুক্ত চেষ্টা ও তদবীর গ্রহণ করতে পারেন, যেন তার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং দৃঢ়তার সাথে অবগত হয়ে যান যে, এদের মধ্যে আর মিলমিশ হওয়ার আশা নেই।

৩) হযরত উমর (রাঃ)-এর কাজ থেকে এটাও ফুটে ওঠে যে, ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। এটা যুক্তিসঙ্গত কথাও। আপন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা আসার অনেক কারণ থাকতে পারে যা অন্যের সম্মুখে প্রকাশ করা যায় না। সে ঘৃণার এমন কারণও থাকতে পারে যে, যদি তা প্রকাশ করা হয় তাহলে শ্রবণকারী তাকে ঘৃণার জন্যে যথেষ্ট না-ও মনে করতে পারে। কিন্তু সেসব কারণ যাকে দিনরাত ভোগ করতে হয় তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তা-ই যথেষ্ট। অতএব কাজী বা বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে শুধু সে ঘটনাটির যাচাই করা যে, স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে কি না? এ বিচার করা তার কর্তব্য নয় যে, স্ত্রী যেসব কারণ বর্ণনা করেছে তা ঘৃণার জন্য যথেষ্ট কি না।

৪) কাজী বা বিচারক উপদেশ দিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর সাথে থাকার ও বসবাস করার জন্য সম্মত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে পারেন। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। কারণ খোলা তার ব্যক্তিগত অধিকার যা আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন। এবং যদি সে এ সম্ভাবনা প্রকাশ করে যে, এ স্বামীর সাথে বসবাস করার মধ্যে সে আল্লাহর সীমানায় ঠিক থাকতে পারবে না, এমতাবস্থায় তাকে এ কথা বলার কারো অধিকার নেই যে, আল্লাহর সীমানাকে তুমি ভেঙ্গে দাও, কিন্তু এ বিশেষ ব্যক্তির সাথে যে কোনভাবেই হোক, তোমাকে থাকতে হবে।

৫) 'খোলার' মাসআলায় মূলতঃ বিচারকের নিখুঁত যাচাইয়ের প্রশ্নই নেই যে, সত্যই কি স্ত্রী ন্যায্য প্রয়োজনের তাগিদে সে খোলার কামনা করে, না কেবল মানসিক কারণেই বিচ্ছিন্নতা চায়? এ কারণে নবী করিম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনরা বিচারক হয়ে যখন খোলার মোকদ্দমার বিবররণ শুনেছেন তখন সে প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। কারণ প্রথমতঃ এ অভিযোগের পুরোপুরি যাচাই কোন বিচারকের সাধ্যের কাজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ নারীর খোলা হচ্ছে পুরুষের সে অধিকারের স্থলাভিষিক্ত যা তাকে তালাকের আকারে দেয়া হয়েছে। স্বাদ অন্বেষণ করার সম্ভাবনা উভয় অবস্থায় সমপরিমাণে রয়েছে। কিন্তু পুরুষের তালাকের অধিকারকে এ শর্তের সাথে

আইনে আবদ্ধ করা হয়নি যে, তা স্বাদ অন্বেষণ করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং আইনের সাথে অধিকারের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, এতে স্ত্রীর খোলার অধিকারও কোন নৈতিক শর্তের সাথে শর্তাধীন হওয়া উচিত নয়।

তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, খোলা কামনাকারিণীর হয়তো সত্যসত্যই খোলার ন্যায্য প্রয়োজন অথবা সে কেবল স্বাদ অন্বেষণকারিণীই হবে। আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয়, তাকে খোলার ক্ষমতা না দিলে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হয়ে যাবে। কারণ যে নারী স্বভাবগতভাবে স্বাদ অন্বেষণকারিণী হবে সে তার রুচির তৃপ্তির তাগিদে কোন না কোনভাবে চেষ্টা করবেই। যদি আপনি তাকে ন্যায্য ও বৈধ মতে তা ভোগ করতে না দেন তাহলে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় স্বীয় স্বভাবের চাহিদা পূরণ করবে এবং তা হবে অধিক মন্দ ও গর্হিত কাজ। কোন এক ব্যক্তির বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ থেকে একবার 'জেনায়' লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সে নারীর পরপর পঞ্চাশজন স্বামী পরিবর্তন করা অধিকতর উত্তম।

৬) যদি স্ত্রী খোলা কামনা করে আর স্বামী তাতে সম্মত না হয় তাহলে কাজী বা বিচারক তাকে বিদায় করে দেয়ার নির্দেশ দেবে। পূর্বোল্লেখিত হাদিসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন এরূপ অবস্থায় অর্থ গ্রহণ করেই স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবেই হোক, কাজীর নির্দেশের অর্থই হচ্ছে বাদী-বিবাদী উভয়েই এই ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য। এমনকি যদি তারা মেনে না নেয়, তাহলে কাজী তাদেরকে কয়েদ করতে পারবে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে কাজীর বা বিচারকের মর্যাদা কেবলমাত্র একজন পরামর্শদাতার মর্যাদার মত নয় যে, তার আদেশ পরামর্শের পর্যায়ের হবে, আর বাদী-বিবাদীর তা গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা থাকবে। যদি বিচারকের মর্যাদা এ পর্যায়ের হয় তাহলে মানুষের জন্য তার বিচারালয়ের দরজা খোলা থাকা নিরর্থক বৈ কিছু হবে না।

৭) নবী করিম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যামতে খোলার পরিণাম হবে, এক তালাক বায়েন। অর্থাৎ স্ত্রীর ইদ্দৎ অতিবাহিত সময়ে তাকে 'রুজু' বা পুনঃগ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেননা পুনঃগ্রহণের অধিকার অবশিষ্ট থাকলে 'খোলার' উদ্দেশ্যই বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়া স্ত্রী যে অর্থ তাকে দিয়েছিল তা বিয়ে বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যই দিয়েছে। যদি স্বামী বিনিময় গ্রহণ করে তাকে মুক্তি না দেয় তাহলে এটা হবে ছলনা ও প্রতারণা যা শরীয়ত কিছুতেই জায়েয মনে করে না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুনরায় তার সাথে বিয়ে বন্ধনে থাকতে ইচ্ছে করে তা সে করতে পারবে। কারণ এটা মোগাল্লাযা তালাক নয়।

৮) 'খোলার' বিনিময় নির্ধারণ করার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা কোন শর্ত আরোপ করেননি। যে কোন বিনিময়ের উপর দম্পতি সম্মত হবে তার উপরেই খোলা হতে পারে। কিন্তু খোলার বিনিময়ে স্বামী তার দেয়া মোহরের বেশী পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। নবী করিম (সাঃ) এটা পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন ঃ

لايأخذالرجل من المختلعة اكثر مما اعطاها

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি খোলাকৃত স্ত্রীর হাতে তাকে যা দিয়েছে তার অধিক গ্রহণ করবে না।

হযরত আলী এ কাজকে স্পষ্ট ভাষায় মাকরূহ বলেছেন। মোজতাহিদ আলেমদেরও এতে ঐক্যমত রয়েছে। হ্যাঁ, যদি স্বামীর অন্যায় নির্যাতনের ফলে স্ত্রী খোলার দাবী করে তাহলে অর্থ বিনিময় গ্রহণ করা মূলতঃ স্বামীর জন্য মাকরূহ হবে। যেমন হেদায়া কেতাবে আছে ঃ

وان كان النشوز من قبله يكره له ان يأخذ منها عوضا -

এ সমস্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখে শরীয়তের মূল সূত্রের অধীনে এই আইন তৈরি করা যেতে পারে যে, যদি খোলা প্রার্থীনী স্বীয় স্বামীর অপরাধ ও অত্যাচার প্রমাণ করে দিতে পারে অথবা খোলার জন্য এমন সব কারণ প্রকাশ করে যা বিচারকের কাছেও যুক্তিসঙ্গত হয় তাহলে মোহরের এক সামান্যংশ অথবা অর্ধেক ফেরত দিয়ে স্ত্রীকে খোলা করিয়ে দেবে। এবং যদি সে স্বামীর অপরাধ প্রমাণ করতে না পারে বা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে সম্পূর্ণ মোহর বা তার একটা বৃহদাংশ ফেরত দেয়া আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু যদি বিচারক তার চালচলনে স্বাদ অন্বেষণকারিণীর লক্ষণ দেখেন তাহলে শাস্তিমূলকভাবে তাকে মোহরের চেয়েও অধিক আদায় করার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারেন।

সম্মানিত পাঠক! খোলার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যা বলেছেন তা কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতেই বলেছেন। সুতরাং তাকে কুরআন-হাদিস অস্বীকারকারী বলে অভিযুক্ত করা জঘন্য অপবাদ মাত্র।

জঘন্য মিথ্যা অপবাদ

মানুষ যখন বিদ্বেষী হয়ে ওঠে তখন তার কাছে সত্য-মিথ্যা, ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরোধীদের বেলায় কথাটি ষোল আনাই সত্য। নিম্নে মাওলানার প্রতি তাদের কয়েকটি মিথ্যা অপবাদ, তাদের লিখিত বইয়ের উদ্ধৃতি এবং তাদের দেয়া মাওলানার বইয়ের উদ্ধৃতি ও তার সাথে মাওলানার লেখা প্রকৃত তথ্য সহকারে লিপিবদ্ধ করলাম।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে শিরক ও গুনাহ্কারী বলার অপবাদ

মাওলানা নাকি বলেছেন– 'ইব্রাহীম (আঃ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।'

(ক) মিস্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম, সম্পাদনায় মাওলানা মনসুরুল হক, ঢাকা।

(খ) জামায়াতে ইসলামী সে মুখালাফাত কিউ, লেখক মাওলানা হাবিবুর রহমান, সিলেট।

(গ) মওদূদীর ইসলামের স্বরূপ, লেখক মাওলানা আশরাফ আলী, বিশ্বনাথ, সিলেট।

তারা সবাই মাওলানার তাফহীমুল কোরআন ১ম খণ্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা যাদের কাছে তাফহীমুল কোরআন ১ম খণ্ড আছে, একটু কষ্ট করে ৫৫৮ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন মাওলানা কি লিখেছেন ঃ

اس سلسلہ میں ایک اورسوال بھی پیدا ہوتا ہے - وہ یہ کہ جب حضرت ابراھیم ع نے تارے کودیکہ کرکھا "یہ میرا رب ہے" اورجب چاند اورسورج کودیکھکرانہیں اپنارب کھا تو کیا وہ اس وقت عارضی طور پر سہی شرك میں مبتلا نہ ہوگئے تھے ؟ اسکا جواب یہ ہے کہ ایك طالب حق اپنی جستجوکے راہ میں سفر کر تے

ھو ئے بیچ کے جن منزلوں پر غور وفکرکیلئے ٹھیرتا ھے - اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ھوتا بلکہ اصل اعتباراس سمت کا ھوتا ھے جس پر وہ پیشں قدمی کررہا ھے اور اس آخری مقام کا ھوتا ھے جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ھے بیچ کی منرلیں ھرجویائے حق کیلئے ناگز یر ھیں۔ ان پر ٹھیرنا بسلسلہ طلب وجستجو ھوتاھے نہ کہ بصورت فیصلہ - اصلا یہ ٹھیراو سوالی اور استفہامی ھواکرتا ھے نہ کہ حکمی - طالب جب ان میں سے کسی منرل پررك کر کہتا ھے کہ " ایساھے" تودر اصل یہ اسکا آخری رائے نہیں ھوتی بلکہ اسکا مطلب یہ ھوتا ھے کہ "ایسا ھے" اور تحقیق سے اسکاجواب نفی میں پاکروہ آگے بڑہ جاتا ھے - اسلئے یہ خیال کرنا بالکل غلط ھے کہ اثنائے راہ میں جیاں جہاں وہ ٹھیرتا وہاں وہاں وہ عارضی طور پر کفر وشرك میں مبتلارہا -

(تفہیم القرآن ج۱ صف ۵۵۸)

অর্থ ঃ এ প্রসংগে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তারকা দেখে বললেন, এটা আমার 'খোদা' এবং চন্দ্র, সূর্য দেখেও এগুলোকে নিজের 'রব' বললেন। তাহলে এ সময় কি তিনি অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে হলেও শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন?

এর উত্তর হল এই যে, সত্যের এক সন্ধানী, সন্ধানের পথে চলতে চলতে মাঝখানে চিন্ত-ভাবনা ও যাচাই করার জন্য যেসব মনজিলে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করে, সেসব মনজিল কখনও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। বরং আসলে বিবেচ্য হচ্ছে এই যে, তার গতি কোন্ দিকে এবং চূড়ান্ত মনজিল কোথায়, যেখানে তার অনুসন্ধান যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। মাঝখানের অবস্থান ঘাটি তো প্রত্যেক অনুসন্ধানীর জীবনে অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনুসন্ধানের কাজেই সেখানে অবস্থান করা হয়। সেটা তার চূড়ান্ত ফয়সালা হয় না কখনও। মূলত ঃ এ অবস্থান হয় জিজ্ঞাসামূলক, সিদ্ধান্তমূলক নয়। এ ধরনের কোন মনজিলে অনুসন্ধানী থেমে যখন চিন্তা করে এটাই মনজিল তখন এর অর্থ এ হয় না যে, একেই সে চূড়ান্ত

মনজিলরূপে মেনে নিয়েছে। বরং তখন এর অর্থ হয়, এটাই কি মনজিল? পরে অনুসন্ধানের সাহায্যে যখন জানতে পারে যে, এটা চূড়ান্ত মনজিল নয় তখন সে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। এ কারণে পথের মাঝখানের অবস্থানসমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অস্থায়ী ও সাময়িক শিরক কিংবা কুফরীতে লিপ্ত ছিলেন বলে মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা ও ভিত্তিহীন।

(তাফহীমুল কোরআন, ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মাওলানার বক্তব্য থেকে কি বুঝলেন? তিনি কি বলেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনায় লিপ্ত ছিলেন? নাকি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তা খণ্ডন করেছেন?

হায় আফসোস! তথাকথিত মুফাসসীর, মুহাদ্দিস ও পীরসাহেবানরা মাওলানার উপর এতবড় একটা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। আল্লাহর ভয় কি তাদের অন্তর থেকে চলে গেছে? আরও আশ্চর্যের বিষয় একটি জঘন্য মিথ্যা কথা একাধিক ব্যক্তি বারবার লেখায় বুঝা যায় যেন মিথ্যা কথা বলা তাদের নিকট সম্পূর্ণ জায়েয হয়ে গেছে। এসব মিথ্যাবাদীর খপ্পর থেকে আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে হেফাজত করুন। (نعوذ بالله)

গুনাহের ব্যাপারেও আমীরের আনুগত্য করা জায়েয বলার অপবাদ

মাওলানা নাকি বলেছেন ঃ 'গুনাহের ব্যাপারেও আমীরের আনুগত্য করতে হবে।' (দেখুন, ফিতনায়ে মওদুদীয়ত, পৃঃ --১৮)

'হযরত উসমান (রাঃ)-এর মধ্যে খিলাফতের যোগ্যতা ছিল না।'

(ফিতনায়ে মওদুদীয়ত, পৃঃ-২১)

ইমাম আবু হানিফাকে ফাসিক-ফাজির বলার অপবাদ

'আবু হানীফা কোন্ চরিত্রবান কিংবা ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি ছিলেন আমি জানি না। এবং তার সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোইবা কতটুকু অকাট্য।'

(ঐ-পৃঃ ২১)

বোখারী শরীফকে দেবতা বলার অপবাদ

'এ বোখারী শরীফের দেবতা কতদিন বগলদাবা করে ফিরবে?।'

(ঐ-পৃঃ -১৪১)

মুহতারাম পাঠক! এ ধরনের লাগামহীন কথা মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর কোন লেখনীতে নেই। জানি না 'ফিতনায়ে মওদূদীয়তের' লেখক হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব কোথেকে এগুলো আবিষ্কার করলেন। এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এমন ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা কিভাবে মাওলানার নামে চালিয়ে দিলেন। তাই তো মনে বারবার প্রশ্ন জাগে এই বই কি সত্যিই তাঁর লেখা?

নেকাহে মোতা জায়েয বলার অপবাদ

মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বলেছেন ঃ যে ক্ষেত্রে জেনা ও নেকাহে মোতা-এ দু'টিরই পথ খোলা থাকে সেক্ষেত্রে নেকাহে মোতা জায়েয।

(মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম ঃ মাওলানার কিতাবের উদ্ধৃতি;
তরজুমানুল কোরআন,সফর সংখ্যা ১৩৭৩ হিঃ)

সম্মানিত পাঠক! আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মোতা বিয়ে কাকে বলে? তাই লিখছি, কোন কিছুর পরিবর্তে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করার নাম মোতা। এ প্রসংগে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি যাতে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

১৯৫৫ ইংরেজীর আগষ্ট মাসে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল কোরআনে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সূরা আল-মুমিনুন-এর একটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে মোতা সম্পর্কে শীয়া-সুন্নীদের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ উল্লেখ করে এক পর্যায়ে বলেন ঃ

. انسان کوبسا اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں جن میں نکاح ممکن نہیں ہوتا ہے اور وہ زنا یا متعہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے - ایسے حالات میں زنا کی بہ نسبت متعہ کر لینا بہتر ہے -

মানুষ অনেক সময় এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। সে জেনা অথবা মোতার মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় তার পক্ষে জেনার চেয়ে মোতা করে নেয়া ভাল।

মাওলানা তাঁর এ কথার সাথে সাহাবাদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে আতা, তাউস এবং হযরত সায়ীদ ইবনে যুবাইরের মাযহাবও উল্লেখ করেন।

মাওলানার উল্লেখিত কথা দ্বারা বাহ্যতঃ অপারগতা অবস্থায় মোতা জায়েয বলে মনে হয়। এ জন্য কেউ কেউ প্রশ্নের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি লেখেন ঃ

اس مسئلہ میں جوکچھ میں ہے لکھا ہے - اس کا مدعادر اصل یہ بتانا ہے کہ صحابہ رض اور تابعین رح میں سے جو چند بزرگ جواز متعہ کے قائل ہوئے ہیں ان کامنشا اس فعل کا مطلق جواز نہ تھا بلکہ وہ اسے حرام سمجھتے ہوئے حالت اضطرار جائز رکھتے تھے اوران میں سے کوئی اس بات کاقائل نہ تھا کہ عام حالات میں متعہ کو نکاح کیطرح معمول بنا یاجائے - اضطرارکی ایک فرضی مثال جومیں نے دی ہے اس سے محض اضطراری حالت کا ایک تصور دلانا مقصودتھا - تاکہ ایک شخص یہ سمجہ سکے کہ شیعہ حضرات کواگر قائلین جواز کا مسلک ہی اختیار کرنا ہے تو انہیں کسس قسم کی مجبوریوں تک اسے محدود رکھنا چاہئے ۔ اس سے میں تو دراصل ان لوںگوں کے خیال کی اصلاح کرنا چاہتاتھا جنہوں نے اضطرار کی شرط ازاکرمتعہ مطلقا حلال تہرادیا ہے - لیکن افسوس ہے کہ آپ کیطرح میری طرزبان سے بہت سے اصجاب کویہ غلط فہمی لاحق ہوگئی کہ میں حالت اضطرار میں اس کو جائز قرار دے رہا ہوں - حالانکہ میں اس کی قطعی حرمت کاقائل ہوں - اور اب سے کئی سال پہلے رسائل ومسائل حصہ دوم صفحہ ۲۰-۲۳ میں اسکی تصریح کر چکاہوں -

ہر حال آپ مطمئن رہیں کہ نظر ثانی کے موقع پر اس عبارت میں ایسی اصلاح کردی جائیگی کہ اس طرح کی کبھی غلط فہمی کا امکان نہ رہے -

(ترجمان القرآن - ج ٤ عدد سونو مبر ١٩٥٥ع)

এ মাস্আলায় আমি যা কিছু লিখেছি এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই বলা যে, সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে যারা মোতা জায়েয হওয়ার প্রবক্তা, তাঁদের নিকট এটা সাধারণভাবে জায়েয নয়। বরং তাঁরা এটাকে হারাম মনে করে অপারগ অবস্থায় জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ এ কথার দাবিদার ছিলেন না যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নিকাহ-এর মত মোতা করা হোক। অপারগতার এক কাল্পনিক উদাহরণ যেটা আমি দিয়েছিলাম এর দ্বারা শুধুমাত্র অপারগ অবস্থার একটা ধারণা দেয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যাতে এক ব্যক্তি এটা বুঝতে পারে যে, শীয়াদেরকে যদি 'মোতা' জায়েযের প্রবক্তাদের মাযহাবকে গ্রহণ করতেই হয় তবে তাদেরকে কি ধরনের অপারগতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, আমি এ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তিদের মনোভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলাম যারা অপারগতার শর্ত উড়িয়ে দিয়ে মোতাকে সাধারণভাবে হালাল করে দিয়েছে। কিন্তু আফসোস। আমার বক্তব্য দ্বারা আপনার মত অনেকের মনে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি নিজে মোতাকে অপারগতা অবস্থায় জায়েয বলে মনে করি। অথচ আমি এটাকে অকাট্যভাবে হারাম মনে করি। এবং কয়েক বৎসর পূর্বে রাসায়েল-মাসায়েল দ্বিতীয় খণ্ডে এর ব্যাখ্যাও দিয়েছি।

যা-ই হোক, আপনি নিশ্চিত থাকুন, পুনঃ প্রকাশের সময় ঐ বাক্যগুলো সংশোধন করে দেয়া হবে, যাতে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি অবকাশ না থাকে।

(তরজমানুল কোরআন, নভেম্বর, ১৯৫৫ ইং)

মাওলানার সংশোধিত বক্তব্য ঃ

متعہ کاجب ذکر آگیا ھے مناسب معلوم ھوتا ھے کہ دوباتوں کی اور توضیح کردی جائے - اول یہ کہ اسکی حرمت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ھے - لہذا یہ کہنا کہ اسے حضرت عمر رض نے حرام کیا یہ کہنا درست نہیں ھے حضرت

عمر رض اس حکم کے موجد نہیں تھے صرف اسے شائع اورنافذ
کرینوا لے تھے - چونکہ یہ حکم حضور صلعم نے آخرزمانے میں
دیاتھا اور عام لوگوں تك نہ پہنچاتھا اسلئے حضرت عمر رض نے
اسکی عام اشاعت کی اوربذریعہ قانون اسے نافذکیا - دوم یہ کہ
شیعہ حضرات نے متعہ کومطلقا مباح ٹھیرانے کا جومسلك
اختیارکیا ھے اسکے لئے تو بہر حال کتاب وسنت میں سرے سے
کوئی گنجائش ہی نہی ھے - صدر اول میں صحابہ اور تابعین اور
فقہاء میں‌سے چند بزرگ جواسکے جوازکے قائل تھے وہ صرف
اضطرار اور شدید ضرورت کی حالت میں جائز رکھتے تھے - اِن
میں سے کوئی بھی اسے نکاح کیطرح مباح مطلق اور عام حالات
میں معمول بہ بنا لینے کا قائل نہ تھا - ابن عباس رض جن کا
نام قائلین جواز میں سب سے زیادہ نمایاکر کے پیش کیاجاتا ھے
- اپنے مسلك کی توضیح خود ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ" وما ھی
لاکالمیتة لا تحل الا للمضطر" (یہ تو مردار کیطرح ھے کہ
مضطرکے سوا کسی کیلئے حلال نہیں) اور اس فتوی سے بھی وہ
اس وقت باز آگئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اباحت کی
گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانہ متعہ کرنے لگے ہیں اور
ضرورت تك اسے موقوف نہیں رکھتے - اس سوال کو اگرنظر انداز
بھی کر دیا جائے کہ ابن عباس رض اور انکے ہم خیال چندگنے چنے
اصحاب نے اس مسلك سے رجوع کرلیا تھا یا نہیں، توان کے
مسلك کو اختیار کرنی والا زیادہ سے زیادہ جواز بحالت اضطرار
کی حدتك جا سکتا ھے مطلق اباحت، اور بلا ضرورت تمتع، حتی
کہ منکوحہ بیویوں تك کی موجودگی میں بھی ممنوعات سنے

استفادہ کرنا تو ایک ایسی آزادی ہے جسے ذوق سلیم بھی گوارا نہیں کرتا کجاکہ اسے شریعیت محمدیہ کیطرف منسوب کیاجائے اور ائمہ اھل بیت کو اس سے متھم کیاجائے میرا خیال ہے کہ خود شیعہ حضرات میں سے بھی کوئی شریف آدمی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اسکی بیٹی یا بہن کیلئے نکاح کے بجائے متعہ کاپیغام دے - اسکے معنی یہ ہو ئے کہ جواز متعہ کیلئے معاشرے میں زبان بازاری کیطرح عورتوں کاایک ایسا طبقہ موجود رہنا چاہئے جس سے تمتع کر نیکا دروازہ کھلارھے - یا پھریہ کہ متعہ صرف غریب لوگوں کی بیٹیور اوربہنوں کیلئے ھو اوراس سے فائدہ اٹھاناخوشحال طبقے کے مردور کا حق ھو - کیا خد اورسول کی شریعت سے اس طرح کی غیر منصفانہ قواینں کی توقع کیجاسکتی ہے ؟ اور کیا خدا اور اسکے رسول سے یہ امیدکی جاسکتی ہے کہ وہ ایسے فعل کو مباح کر دینگے جسے ہر شریف عورت اپنے لئے ھے عزتی بھی سمجھے اور بے حیائی بھی؟ (تفہیم القرآن ، سورہ المؤمنون - آیہ ۷)

অর্থ ঃ প্রসংগত 'মোতা' সম্পর্কে দু'টি কথার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেয়া জরুরী। প্রথম এই যে, এর হারাম হওয়ার কথা স্বয়ং নবী করিম (সাঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। এটাকে হযরত উমর (রাঃ) হারাম করেছেন, এ কথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রাঃ) এ নিষেধের উদ্গাতা নন, তিনি শুধু এর প্রচার ও এটাকে কার্যকরী করেছিলেন। যেহেতু নবী করিম (সাঃ) তাঁর সময়ের শেষের দিকে এটার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ কারণে এটা সাধারণ্যে প্রকাশ হতে পারে নাই। সুতরাং হযরত উমর (রাঃ) তার সাধারণ প্রচার করেন এবং আইনের সাহায্যে তাকে কার্যকর করেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক শ্রেণীর শীয়া মতাবলম্বীরা এটাকে শর্তহীন অবাধভাবে জায়েজ ও মুবাহ মনে করেছে। কুরআন-সুন্নায় তো এর সমর্থনে কোনই দলিল

পাওয়া যেতে পারে না। প্রথম কালের সাহাবী, তাবেয়ীন ও ফিকাহবিদগণের মধ্যে যে ক'জন এটাকে জায়েয মনে করতেন, তাঁরা এটাকে কেবলমাত্র কঠিন ঠেকা ও অসাধারণ প্রয়োজনের অবস্থায়ই জায়েয মনে করতেন। তাঁদের কেউই এটাকে বিয়ের মত অবাধভাবে মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য মনে করার পক্ষপাতি ছিলেন না। এ পর্যায়ে প্রথম নাম করা হয় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর। তিনি তাঁর নিজের কথার দ্বারাই এর ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন ঃ

وماهى الاكالميتة لا تحل الا للمضطر -

এটা মৃত লাশের মতই হারাম। আর কঠিন প্রয়োজন ছাড়া এটা কারো জন্য হালাল নয়।

আর ফতোয়াও তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন তখন, যখন দেখলেন যে, মোতাকে মুবাহ্ পেয়ে লোকেরা এটাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে এবং স্বাধীনভাবে মোতা করে যাচ্ছে। এবং এর কোন প্রয়োজনের অপেক্ষাই রাখে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কি করেন নাই সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, যারা মোতাকে জায়েয মনে করেন, তারা বড়জোর বলতে পারেন যে, নেহায়েত ঠেকার সময় এটা জায়েয- এর বেশি নয়। কিন্তু এটাকে বিনা শর্তে মুবাহ মনে করা এবং বিনা প্রয়োজনেও এটা গ্রহণ করা–এমনকি বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান থাক সত্ত্বেও মোতা করা এমনই এক যৌন স্বাধীনতা এবং উচ্ছৃংখলতা যে, এটাকে শরীয়তে মোহাম্মদীয়ায় জায়েয বলা তো দূরের কথা, মানুষের সুস্থ রুচিও এটা বরদাশত করতে পারে না। আর আহলে বায়েত-এর ইমামগণকে এজন্য দোষী করা তো মহা অন্যায়। আমার মনে হয়, শীয়াদের মধ্যেও কোন শরীফ ব্যক্তিই তার মেয়ে বা ভগ্নির জন্য মোতার প্রস্তাবকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। জায়েয করতে হলে সে সংগে সমাজে বারবনিতাদের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর এমন একদল নারী সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, যাদের সঙ্গে মোতা করা যাবে। অথবা মোতা করা হবে শুধু গরীব লোকদের মেয়ে-বোনদের সঙ্গে। আর এর সুযোগ গ্রহণ করবে কেবল ধনী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহর শরীয়তে এরূপ অন্যায়-অনাচারপূর্ণ কোন আইন থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়? আর যে কারণে প্রত্যেক ভদ্র ও শালীনতাসম্পন্ন নারী নিজের জন্য এটাকে অপমানকর ও নির্লজ্জতা মনে করবে, এমন কোন কাজকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুবাহ করতে পারেন বলে কি মনে করার কোন সংগত কারণ আছে?

(তাফহীমুল কোরআন, সূরা আল- মুমিনুন, টিকা নং ৭)

সম্মানিত পাঠক! মাওলানার এত পরিষ্কার বক্তব্যের পরও যদি কেউ বলে যে, মাওলানা মোতাকে জায়েয মনে করেন, তাহলে তাদের জন্য হেদায়েতের দো'আ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

সিনেমা দেখা জায়েয বলার অপবাদ

মাওলানার উপর অপবাদ ঃ তিনি নাকি বলেছেন, 'প্রকৃত রূপে সিনেমা দেখা যায়েয।'

(দেখুন, মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম এবং মাওলানার কিতাবের
উদ্ধৃতি ঃ রাসায়েল-মাসায়েল ২য় খণ্ড ১৬৬ পৃঃ)

মুহতারম পাঠক! 'মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম' নামক বইয়ের লেখক মাওলানার উক্তি পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে সত্যের অপলাপ করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, একজন ছাত্র সিনেমা সম্পর্কে মাওলানার কাছে প্রশ্ন পাঠালে মাওলানা এর বিস্তারিত উত্তর দেন। নিম্নে প্রশ্ন ও মাওলানার উত্তর লিপিবদ্ধ করলাম। এ দ্বারা বুঝতে পারবেন মাওলানা কি বলেছেন এবং তাঁর বিরোধীরা তাঁর কথাকে বিকৃত করে কি বলতে চাচ্ছে।

سوال : میں ایك طالب علم هوں - میں نے جماعت اسلامی کے لیٹریچر کاوسیع مطالعه کیا هے خداکے فضل سے مجه میں نمایاں ذهنی وعملی انقلاب رونما هواهے مجهے ایك زمانے سے سینما توگرا فی سے گهری فنی دلچسپی هے اور اس سلسلے میں کافی معلومات فراهم کی هیں تطر یات کی تبر بلی کے بعد میری دلی خواهش هے که اگر شرعا ممکن هوتو اس فن سے دینی واخلاقی خدمت لی جائے - آپ براه نوازش مطلع فرمائیں که اس فن سے استفادے کی گنجائش اسلام میں ہے یانهیں ؟ اگر جواب اثبات میں هو تو پهر یه بهی واضح فرمائیں که عورت کا کردار پرده فلم پرد کهانیکی بهی کوئی جائز صورت ممکن نهیں ؟

(رسائل ومسائل حصه دوم)

প্রশ্ন ঃ আমি একজন ছাত্র। জামায়াতে ইসলামীর রচনাবলী বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ্‌র ফজলে আমার মধ্যে আকিদা ও আমলের দিক দিয়ে এক বিপ্লব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক যুগ থেকে চলচ্চিত্রের সাথে আমার বেশ হৃদ্যতা ও আকর্ষণ চলে আসছে। এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্ঞানও অর্জন করেছি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব হয়, তাহলে তা দ্বারা ধর্মীয় ও চারিত্রিক খেদমত নেয়া উচিত।

আপনি অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন উক্ত বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ ইসলামে আছে কি না? যদি থেকে তাকে তাহলে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিবেন যে, ফিল্মের পর্দায় মহিলাদের কর্মকাণ্ড দেখার জায়েয পন্থা আছে কি না ?

(রাসায়েল-মাসায়েল ২য় খণ্ড)

جواب : میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ خیال ظاہرکرچکاھوں کہ سینمابجائے خود جائز ہے - البتہ اسکا ناجائز استعمال اس کوناجائز کردیتاھے - سینما کے پردے پرجو تصویر نظر آتی ہے وہ دراصل "تصویر" نہیں بلکہ پرچھائیں ہے جس طرح آئینے میں نظر آیا کرتی ہے اس لئے وہ حرام نہیں - رہاوہ عکس جو فلم کے اندرھوتا ہے تو وہ جب تك كاغذ یاکسی دوسری چنیر پر چھاپ نہ لیا جائے ، نہ اس پر تصویر کا اطلاق ھو تا ہے اورنہ وہ ان کامون میں سے کسی کام کے لئے استعمال کیاجا سکتا ہے جن سے بازر ھنے ھی کی خاطر شریعت میں تصویر کو حرام کیاگیا ھے - ان وجوہ سے میر ے نزدیك سینما بجائے خودمباح ھے -

جہان تك اس فن کوسیکھنے کا تعلق ھے کوئے وجہ نہیں کہ آپ کو اس سے منع کیا جائے آپ کا اس طرف میلان ھے توآپ اسے سیکہ سکتے ھیں ۔ بلکہ اگر مفید کامون میں اسے استعمال کرنیکا ارادہ ھو توآپ اسے ضرور سیکھین - کیونکہ یہ قدرت

کی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت ھے اورھم یہ چاہتے ھیں کہ اسے بھی دوسری فطری طاقتوں کے ساتھ خدمت حق اورمقاصد خیر کیلئے استعمال کیاجائےخدا نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کی ھے ، انسان کی بھلائی کیلئے اور حق کی خدمت کیلئے پیدا کی ھے - یہ ایک بد قسمتی ھوگی کہ شیطان کے بندے تو اسے شیطانی کاموں کیلئے خوب خوب استعمال کریں اورخداکے بندے اسے خیر کے کاموں میں استعمال کرتے سےپر ھیز کرتے رھیں -
اب رھا فلم کواسلامی اغراض اور مفید مقاصد کیلئے استعمال کرنیکا سوال تواس میں شك نہیں کہ بظاھر ایسے معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی اور ثار یخی فلم بنا نےمیں کوئی قباحت نظر نہیں آتی جوفواحش اور مہتیجات اورتعلیم جرائم سے پاك ھوں، اورجن کااصل مقصدبھلائی کی تعلیم دینا ھو - لیکن غورسے دیکھے تو معلوم ھوگا کہ اس میں دوبڑقباحتیں جن کاکوئی علاج ممکن نہیں ھے -

اول یہ کہ کوئی ایسا معاشرتی فلم بنانا سخت مشکل ھے جس میں عورت کا سرے سے کوئی پارٹ نہ ھو - اب اگرعورت کا پارٹ رکھا جائے اسکی دوھی صورتیں ممکن ہیں ۔ ایك یہ کہ اس میں عورت ہی ایکٹر ھو - دوسرے یہ کہ اس میں مردکو عورت کاپاٹ دیاجائے - شرعاً ان میں سے کوئی بھی جائزنہین ھے -

دوم یٔہ کہ کوئی معاشرتی ڈراما بہرحال ایکٹینگ کے بغیر نہین بن سکتا - اور ایکٹینگ میں ایك عظیم الشان اخلاقی خرابی یہ ھے کہ ایکٹرآئےدن مختلف سیرتوں اور کرداروں کا

سوانگ بھرتے بھرتے بالاخر اپنا انفرادی کیر یکٹر بالکل نہیں تو بڑی حدتك کھو بیٹھتا ھے - اسطرح چاھے ھم فلمی ڈراموں کومعاشرے کی اصلاح اور اسلامی حقائق کی تعلیم وتبلیغ ہی کیلئے کیوں نہ استعمال کریں ہمیں بہر حال چند انسانوں کواس بات کیلئے تیارکرنا پڑ یگا کہ وہ ایکٹر بن کر اپنا انفرادی کیر یکٹر کھو دیں - یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی شخصیت کی قربانی دیں - میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کی بھلائی کیلئے یاکسی دوسرے مقصد کی لئے خواہ وہ کتناھی پاکیزہ اوربلند مقصد ھوکسی انسان سے شخصیت کی قربانی کا مطالبہ کیسے کیا جاسکتا ھے - جان، مال، عیش؛ آرام ھر چیز توقربانی کی جاسکتی ھے اور مقاصد عالیہ کیلئے ا ء کیجانی چاہیئے مگر یہ وہ قربانی ھے جسکا مطالیہ خود اللہ تعالی نے اپنےلئے بھی نہیں کیا ھے کجاکہ کسی اور کیلے اس کا مطالبہ کیا جاسکے-

ان وجوہ سے میرے نزدیك سینما کی طاقت کوفلمی ڈراموں کیلئے استعمال نہیں کیاجاسکتا ھے -

پھرسوال پیدا ھوتا ھے کہ یہ طاقت اور کسس کام میں لا ئی جا سکتی ھے ؟

میرا جواب یہ ھے کہ ڈرامے کے سوا دوسری بہت سی چیزیں بھی ہیں جو فلم میں دیکھائی جاسکتی ہیں اور وہ ڈرامے کے بہ نسبت بہت زیادہ مفید ہیں - مثلا : ھم جغرافی فلموں کے ذریعہ سے اپنے عوام کوزمیں اور اسکے مختلف حصوں کے حالات سے اتنی وسیع واقفیت بھم پہنو نچا سکتے ھیں کہ گویا وہ دنیا بھرکی سیاحت کرآئے ہیں - اسی طرح ھم مختلف قوموں اور ملکوں کی

زندگی کے نے شمارپہلوان کو دکھا سکتے ہیں جن سے ان کو بہت سے سبق بھی حاصل ھونگے اوران کا نقطہ نظربھی وسیع ھوگا -

ہم علم ھیئت کے حیرت انگیز حقائق اورمشاھدات ایسے دلچسپ طریقوں سے پیش کرسکتے ھیں کہ شھوانی فلموں کی دلچسپیاں بھول جائیں - اورپھر یہ فلم اتنے سبق آموز بھی ھوسکتے ھیں کہ لوگوں کے دلوں پر توحید اوراللہ کی ھیئت ک سکہ بیٹھ جائے -

ھم سا ئنس کے مختلف شعبوں کوسینما کے پردے پراسطرح پیش کرسکتے ہیں کہ عوام کو ان سے دلچسچی بھی ھو اور انکو سائنٹفک معلومات بھی ھمارے انڑر گریجویٹوں کے معیارتك بلند ھوجائیں -

ھم صفائی اور حفظان صحت اور شہریت کی تعلیم بڑی دلچسپ انداز سے لوگوں کو دےسکتے ھیں، جس سے ہمارے دیہاتی اور شھری عوام کی محض معلوماتِ ھی وسیع نہ ھونگے بلکہ وہ دنیا میں اس انسانوں کیطرح جینے کا سبق بھی حاصل کرینگے - اس سلسلے میں ھم دنیاکی ترقی یافتہ قوموں کے مفیدنمونے بھی لوگوں کودکھا سکتے ھیں تاکہ وہ انکے مطابق اپنے گھرور اور اپنی بستیوں اور اپنی اجتماعی زندگی کو درست کرنے کی طرف متوجہ ھوں -

مختلف صنعتوں کے ڈھنگ، مختلف کارخانوں کے کام، مختلف اشیأ کے بننے کی کیفیت اور زراعت کے ترقی یافتہ طریقے سینما کے پردے پردکھا سکتے ہیں جن سے ہماری صنعت پیشہ آبادی کے معیارکارکردگی میں غیر معمولی اضافہ ھو سکتا ھے -

هم سینما سے تعلیم بالغان کا کام بھی لے سکتے هیں اوراس کام کواتنا دلچسپ بنایاجاسکتا هے کہ أن پڑہ عوام اس سے ذرانہ اکتائیں -

هم اپنے عوام کوفن جنگ کے ، سول ڈیفنس کی، گوریلا وارفیرکی، گلیوں اور کوچوں میں دفاعی جنگ لڑنے کی، اور ہوائی حملوںسے تحفظ کی ایسی تعلیم دےسکتے هیںکہ وہ اپنے ملك کی حفاظت کیلئے بہتربن طریقے پرتیارهوسکیں - نیزهوائی اور بری اوربحری لڑائیوں کے حقیقی نقشے بھی ان کودکھاسکتے هیں تاکہ وہ جنگ کے عملی حالات سے باخبرهوجائیں -

یہ اور ایسے هی بہت سے دوسرے مفیداستعمالات سینما کے هوسکتے هیں - مگر ان میںسے کوئی تجویز بھی اس وقت تك کامیاب نہیں هوسکتی جب تك کہ ابتداء حکومت کی طاقت اور اسکے ذرائع اسکی پشت پرهوں - اس کے لئے اولین ضرورت یہ هے کہ عشق بازی اور جرائم کی تعلیم دینے والے فلم ایك لخت بندکر دیئے جائیں - کیونکہ جبتك اس شراب کی لت زبردستی لوگوں سے چھڑ ائی نہ جائیگی - کوئی مفید چیزان کے منہ کو لگنی محال هے - دوسری اهم ضرورت یہ هے کہ ابتداء میں مفید تعلیمی فلم حکومت کوخود اپنے سرمائے سے تیارکرانےهونگے اوران کو عوام یں رواج دینے کی کوشش کرنی هوگی - یہاں تك کہ جب کاروباری حیثیت سے یہ فلم کامیاب هونے لگیں گے - تب نجی سرمایہ اس صنعت کی طرف متوجہ هوگا -

(رسائل ومسائل حصئہ دوم)

মাওলানার জবাব ঃ

আমি এর পূর্বেও একাধিকবার এ খেয়াল প্রকাশ করেছি যে, সিনেমা মূলতঃ বৈধ। অবশ্য অবৈধ ব্যবহার তাকে হারাম বানিয়ে দেয়। সিনেমার পর্দায় যে ছবি প্রদর্শিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে ছবি নয়, বরং প্রতিচ্ছবি। যেমনভাবে আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অতএব তা হারাম নয়। বাকি থাকে ঐ প্রতিচ্ছবি যা ফিল্মের মধ্যে থাকে। এ ব্যাপারে কথা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত কাগজ অথবা অন্য কোন জিনিসের উপর তার ছাপ না লওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ফটো বলা যায় না। বরং তা এমন কাজেও ব্যবহর করা সম্ভব হয় না, যা থেকে বিরত থাকার জন্যে শরীয়ত ফটোকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। এ কারণে আমার মতে সিনেমা মূলত মোবাহ।

এ বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে কথা হল, আপনাকে নিষেধ করার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার ঐ দিকে ঝোঁক আছে, বেশ আপনি শিখতে পারেন। বরং যদি ভাল কাজে তাকে ব্যবহার করার নিয়ত রাখেন তাহলে অবশ্যই শিখবেন। কেননা তা কুদরতী শক্তিগুলোর মধ্যে একটি শক্তি। আমরা চাই অন্যান্য প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত শক্তিগুলোর মত তাকেও সত্য, ন্যায় ও সৎ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হোক। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় যা-ই সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মঙ্গল ও সত্যের খেদমত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা একটা দুর্ভাগ্য যে, শয়তানের বান্দাহরা তাকে শয়তানী কাজের জন্য খুব ব্যবহার করবে আর আল্লাহর বান্দাহরা তাকে ভাল কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

এখন থাকল ফিল্মকে ইসলামী ও সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রশ্ন। তবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ রকম সামাজিক, চারিত্রিক সংস্কারমূলক এবং ঐতিহাসিক ফিল্ম বানানোর মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না– যা নির্লজ্জ যৌন উত্তেজনাপূর্ণ ও অপরাধমূলক শিক্ষা হতে পবিত্র থাকে এবং যেটার আসল উদ্দেশ্য হবে শুধু সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দেয়া। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, এতে দুটো বড় বড় দোষ পরিলক্ষিত হয়, যা থেকে পরিত্রাণের কোন পন্থা বা সমাধান পাওয়া যায় না।

প্রথম দোষ এই যে, এ রকম কোন সামাজিক ছবি বা ফিল্ম তৈরি করাই মুশকিল যাতে মহিলাদের কোন অংশ থাকবে না। এখন যদি মহিলাদের অংশ রাখতে হয় তাহলে দু'টি পন্থাই রাখা যেতে পারে, একটা হল এতে মহিলাই এ্যাকটার হবে আর দ্বিতীয়টি হল এতে পুরুষকে মহিলার অংশ দেয়া হবে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনটিই বৈধ নয়।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, কোন সামাজিক ড্রামা এ্যাকটিং ব্যতীত হতে পারে না। অথচ এ্যাকটিং-এর মধ্যে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক চারিত্রিক দোষ এই যে, এ্যাকটিং-এর সময় বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন নায়কদের সাথে মাখামাখি করতে করতে অবশেষে স্বীয় চরিত্র একেবারে না হলেও অধিকাংশ খোয়াতে হয়। এভাবে এ্যাকটিং-এর ফিলমগুলোকে সামাজিক সংশোধন এবং ইসলামী বাস্তবতার শিক্ষা প্রচারে যখনই আমরা ব্যবহার করতে চাইব তখনই কিছু ব্যক্তির্বগকে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র খোয়াবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আমি বুঝি না সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা যতই পবিত্র ও উন্নত হোক না কেন কোন ব্যক্তি হতে তার ব্যক্তিত্বের বলি কিভাবে চাওয়া যেতে পারে? মাল, আয়েশ-আরাম সবকিছু কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু এটা এমন এক কোরবানী বা আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্যও চাননি, অন্যের জন্য তো দূরের কথা। এসব কারণে আমার মত হচ্ছে, সিনেমার শক্তিকে এ্যাকটিং-এর ফিলমের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে এ শক্তি কোন্ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে? এর জবাব এই যে, এ্যাকটিং ব্যতীত আরও অনেক জিনিস আছে যাকে ফিলমে দেখানো যেতে পারে এবং তা এ্যাকটিং-এর তুলনায় অধিকতর উপকারী ও বিবেচিত হবে। যেমন ঃ

১) ভৌগলিক ফিল্ম দ্বারা আমরা সাধারণ মানুষদেরকে পৃথিবী এবং এর বিভিন্ন অংশের অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্ঞান বিতরণ করতে পারি– যাতে তারা মনে করবে যেন তারা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে এসেছে।

২) এভাবে আমরা বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার অগ্রগতির ধারা জনসাধারণকে দেখাতে পারি– যাতে তাদের অনেক কিছুই শিক্ষা হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রশস্ত হবে।

৩) জীববিদ্যা সম্পর্কে এমন সব আশ্চর্যজনক তত্ত্ব ও চিত্র এমনি অভিনব পদ্ধতিতে তুলে ধরতে পারি যে, লোকেরা যৌন উত্তেজনাপূর্ণ আকর্ষণ ভুলে যাবে। অতঃপর ফিল্ম এরকম শিক্ষণীয় হবে যে, লোকদের অন্তরের মধ্যে একত্ববাদ ও আল্লাহর ভয়ের ছাপ অংকিত হয়ে যাবে।

৪) বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সিনেমার পর্দায় এমন নিখুঁতভাবে আমরা পেশ করতে পারি যে, সাধারণ মানুষ তা দেখে আকর্ষণ বোধ করবে এবং তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একজন আন্ডার গ্রেজুয়েটের সীমা পর্যন্ত উন্নীত হবে।

৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাগরিকতার শিক্ষা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে দেয়া যেতে পারে– যা দ্বারা আমাদের গ্রামীণ ও শহরের সাধারণ মানুষের জ্ঞানই বৃদ্ধি পাবে না বরং তারা দুনিয়ার বুকে মানুষ হিসাবে বসবাস করার শিক্ষাও অর্জন করতে পারবে। এতদভিন্ন এর দ্বারা আমরা দুনিয়ার উন্নত জাতির উন্নত নমুনাও লোকদের দেখাতে পারব– যাতে এরাও তাদের মত নিজেদের ঘর, বস্তি এবং সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠু করার দিকে মনোযোগী হতে পারে।

৬) বিভিন্ন কারিগরী ও তার ধরন, বিভিন্ন কারখানার কাজ, বিভিন্ন জিনিস তৈরি হওয়ার নিয়মাবলী এবং কৃষি উন্নতির পন্থাগুলো সিনেমার পর্দায় দেখানো যেতে পারে–যার মাধ্যমে আমাদের কারিগরি ও কৃষি পেশা জ্ঞানগত ও কর্মগত মানে উন্নতির সংযোজন হতে পারে।

৭) সিনেমা দ্বারা বয়স্ক শিক্ষার কাজ আনজাম দেয়া যেতে পারে এবং এ কাজকে এমন চিত্তাকর্ষক করে তোলা যেতে পারে যে, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও এতে বিরক্তি বোধ করবে না।

৮) সিনেমার পর্দায় সাধারণ মানুষদেরকে যুদ্ধ বিদ্যা, ডিফেন্স বাহিনীর আক্রমণ, গেরিলা যুদ্ধ, অলিগলিতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এমন শিক্ষা দেয়া যেতে পারে যা নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য উত্তম পন্থা বিবেচিত হবে। এতদ্ভিন্ন বিমান, নৌ ও স্থল যুদ্ধে বাস্তব নকশাও তাদের দেখানো যেতে পারে। এতে তারা যুদ্ধের কার্যকরী অবস্থার পূর্বেই সজাগ থাকতে পারবে। এ রকম আরও অনেক উপকারমূলক কাজ সিনেমার দ্বারা হতে পারে।

কিন্তু এর কোন একটি প্রস্তাব ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রারম্ভিকভাবে সরকারের শক্তি ও মাধ্যমগুলো এর পৃষ্ঠপোষকত না করবে। এর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ এবং অপরাধমূলক সমস্ত ফিল্ম একেবারে বন্ধ করে দেয়া। কেননা যতক্ষণ ঐ রকম ব্যাধি লোকদের থেকে জোর করে ছাড়ানো না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন উপকারী জিনিসই তাদের ভাল লাগবে না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উপকারী ও শিক্ষণীয় ফিল্মগুলো প্রথমে সরকারের নিজের পুঁজি দ্বারা তৈরি করতে হবে এবং তা সাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করতে হবে। এমনকি যখন ব্যবসায়ে এ ফিল্ম বেশ কৃতকার্য প্রমাণিত হতে শুরু করবে কেবল তখনই ব্যবসায়ী মূলধন উক্ত কাজের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(রাসায়েল-মাসায়েল দ্বিতীয় খণ্ড)

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ। উল্লেখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে কি বুঝলেন? মাওলানা কি বর্তমানে প্রচলিত সিনেমাকে জায়েয বলেছেন, না ওটাকে হারাম বলে হালাল করার জ্ঞানগর্ভে পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় মাওলানার বিরোধী মূর্খরা তাঁর বক্তব্যের পূর্বাপর সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এ কথাই বুঝাতে চায় যে, মাওলানা বর্তমানে প্রচলিত সিনেমাকে জায়েয বলেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে দীয়ানতদার হবার তৌফিক দান করুন!

আল্লাহ্র আইন জিনার শাস্তিকে জুলুম বলার অপবাদ

মাওলানার উপর অভিযোগ ঃ তিনি নাকি আল্লাহর আইন জেনার শাস্তি-–রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে মারাকে জুলুম বলেছেন।

(দেখুন মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলামগ্রন্থে তাফহীমাত ২য় খণ্ডের উদ্ধৃতি)

মুহতারাম পাঠক! আপনারা তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ড খুলে দেখুন মাওলানা কি লিখেছেন। যারা আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দিক-বিদিক হারিয়ে ইসলামী আইনকে বর্বরোচিত আইন বলে আখ্যায়িত করে, তাদের উত্তর দিতে গিয়ে মাওলানা ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ মাসের মাসিক তরজুমানুল কোরআনে এক দীর্ঘ আলোচনা রাখেন।

(যা পরবর্তীতে তাফহীমাত ২য় খণ্ডে 'হাত কাটা ও শরয়ী শাস্তি' শিরোনামে সন্নিবেশিত করা হয়।)

মাওলানা তাঁর আলোচনায় বলেন ঃ সর্বপ্রথম এ সামগ্রিক নীতিমালাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, হাত কর্তনের শাস্তি এবং অন্যান্য শরয়ী শাস্তি এমন স্থানেই কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্টি, সভ্যতা, সামাজিক শৃংখলা ও বিধি-বিধান ইসলাম সমর্থিত পন্থায় পরিচালিত। ইসলামের মূলনীতি এবং আইন-কানুন পরস্পর অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। এটা মোটেই পরিশুদ্ধ নয় যে, কিছু সংখ্যক মূলনীতি এবং বিধি-বিধান কার্যকর করা হবে আর কিছু সংখ্যক পরিতজ্য অবস্থায় রাখা হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচারী ও মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তিকে ধরা যেতে পারে। বিয়ে, তালাক এবং শরয়ী পর্দার ব্যাপারে ইসলামী আইন-কানুন এবং যৌনগত চরিত্রের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা উল্লেখিত শাস্তির সাথে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারী ও মিথ্যা অপবাদকারীর জন্য এরকম

কঠোর শাস্তি শুধুমাত্র ঐ সমাজের উদ্দেশ্যেই নির্ধারিত করেছেন, যে সমাজে মহিলারা সাজসজ্জা ও আকষর্ণীয় অবস্থায় চলাফেরা করে না। যে সমাজে উলংগ-অর্ধউলংগ ছবি এবং প্রেম-প্রীতির কিচ্ছা-কাহিনী ও যৌন উত্তেজনাকে সর্বদা সঞ্চারিত ও আন্দোলিত করার মত কোন রং-তামাশার প্রচলন নেই, যেখানে বিয়ের জন্য পূর্ণ সহজতা বিরাজমান, এ ছাড়া যেখানে বিয়ে বিচ্ছেদ, তালাক ও খোলা সম্পর্কীয় ইসলামী আইন-কানুন সঠিকভাবে কার্যকর। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী এমন ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত সমাজই এর পূর্ণ দাবিদার যে, এখানে তার সংরক্ষণ ও হেফাজতের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হোক। এ ছাড়া যখন জায়েয পন্থায় যৌনগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এবং সামাজিক অবস্থাকে দুষ্টামীর সহজতাও অসাধরণ উত্তেজনাপূর্ণ মাধ্যমগুলো থেকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে, তখন এ অবস্থায় এতবড় শাস্তি কোনক্রমেই বেইনসাফী নয়। এ অবস্থায় যৌন অপরাধ শুধুমাত্র যেমন লোকের দ্বারা সম্ভব, যারা সীমাতিরিক্ত খারাপ স্বভাবের এবং যাদের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর সৃষ্টিকে হেফাজত করার জন্য অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

এরপর মাওলানা বলেন ঃ

لیکن جہاں حالات اس سے مختلف ہوں، جہاں عورتوں اور مردوں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی، جہاں مدرسوں میں، دفتروں میں، کلبوں اور تفریح گاہومیں،خلوت اور جلوت میں ہرجگہ جوان مردوں‌اور بنی تہنی عورتوں کو آزادانہ ملنے جلنے اورساتہ اتہنے بیئھنے کا موقع ملتا ہو، جہاں ہرطرف بے شمارصنفی محرکات پہیلے ہوئے ہوں اور ازدواجی رشتے کے بغیر خواہشات کی تسکیں کیلئے ہرقسم کی سہولتیں بہی موجود ہوں، جہاں معیار اخلاق بہی اتناپست ہوکہ ناجائزتعلقات کوکچہ بہت معیوب نہ سمجہا جاتا ہو - ایسی جگہ زنااور قذف کی شرعی حدلری کرنا بلاشبہ ظلم ہوگا - اسلئے کہ وہان ایك معمولی قسم کے معتدل مزاج اور سلیم الفطرت ادمی کا بہی زناسے بچنا

مشکل ھے - اورایسے حالات میں کسی شخص کا مبتلائے گناہ ہونایہ نیتجہ نکالنے کے لئے کافی نہیں ھے کہ وہ غیرمعمولی قسم کا اخلاقی مجرم ھے - رجم اور کوڑوں‌کی سزا درحقیقت ایسے گندے حالات کیلئے اللہ نے مقرر ھی نہیں کی ھے -

(تفہیمات حصئہ دوم)

কিন্তু যেখানকার অবস্থা এর থেকে ভিন্নতর-যেখানে নর-নারীর সমাজ সহাবস্থানে রাখা হয়েছে, যেখানে স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত, ক্লাব ও পার্কে যুবক-যুবতীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, উঠাবসা ও মেলামেশার অবাধ সুযোগ রয়েছে; যেখানে চারদিকে যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ীপূর্ণ মাধ্যম বিস্তৃত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সকল প্রকার সুযোগ বিরাজমান এবং যেখানে চারিত্রিক মানদণ্ড এতই নিম্নস্তরে যে, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকে দোষনীয় মনে করা হয় না এমন স্থানে ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদের জন্য শরয়ী শাস্তি কার্যকর করা নিঃসন্দেহে জুলুম। কারণ এমন সমাজে সাধারণ প্রকৃতি, মধ্যম চরিত্র এবং পরিশুদ্ধ মস্তিষ্কপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষেও ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। আর এমতাবস্থায় কোন ব্যাক্তি অপরাধে লিপ্ত হওয়ায় এ ফলাফল বের করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, এ ব্যক্তি অস্বাভাবিক ধরনের চারিত্রিক দোষে দোষী। রজম এবং বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রকৃতপক্ষে এরকম দুর্গন্ধময় সমাজের জন্য আল্লাহ তায়া'লা নির্দিষ্ট করেননি।

সম্মানিত পাঠক! দেখলেন তো মাওলানা কি বলেছেন, আর তার বিরোধীরা কি বলছেন! মাওলানা বলেছেন ব্যভিচার, চুরি এবং অন্যান্য অপরাধের শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করার আগে ওগুলোর প্রতি আকৃষ্টকারী সকল পথ ও মাধ্যম বন্ধ করতে হবে এবং এরপর শাস্তি কার্যকর করতে হবে। কিন্তু ওগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করার সকল মাধ্যম বহাল রেখে হঠাৎ করে শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। আর জুলুমকারী হবে তারা যারা এ শাস্তি প্রয়োগ করবে, আল্লাহ তায়ালা নন। অথচ মাওলানার বিরোধীরা বুঝাতে চায় যে, মাওলানা বলেছেন, জুলুমকারী হবেন আল্লাহ তায়ালা। নাউজুবিল্লাহ!

মাওলানা এটাও বলেছেন যে, এ শাস্তি ঐ সমাজে প্রয়োগ করা যাবে, যে সমাজে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্টি, সভ্যতা ও সামাজিক শৃংখলা ইসলাম সমর্থিত পন্থায় পরিচালিত। আর যে সমাজের অবস্থা

এরূপ নয়, সেখানে ইসলামের দণ্ডবিধির এ আইনগুলো হঠাৎ করে গ্রহণ করে তা প্রয়োগ করা জুলুম। কিন্তু অপবাদদানকারীরা মাওলানার বক্তব্যের পূর্বাপর সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র বলতে চায়, মাওলানা আল্লাহর আইনকে জুলুম বলেছেন। আল্লাহ তাদের এ ষড়যন্ত্র থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

দুই সহোদর বোনকে একসাথে বিয়ে করা জায়েয বলার অপবাদ

মাওলানার উপর অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি নাকি দুই সহোদর বোনকে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন যা কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়া'লা পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসল ব্যাপার হচ্ছে, মাওলানা যখন মূলতান জেলে তখন এক ব্যক্তি তার কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্ন পাঠান ঃ

প্রশ্ন ঃ বাহওয়ালপুরে দু'টি একদেহীভুত যমজ বোন আছে, জন্মলগ্ন থেকে যাদের কাঁধ, পার্শ্বদেশ ও কোমরের হাড় জোড়া ছিল। কোনক্রমেই তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব ছিল না। জন্মের পর থেকে এখন যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত তারা চলাফেরা করছে। তাঁদের একই সঙ্গে ক্ষুধা লাগে, একই সঙ্গে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়। এমনকি যদি তাদের একজন কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে অন্যজনও তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের সাথে তাদের দু'জনের বিয়ে হতে পারে কি না? স্থানীয় আলেমগণ একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়ার অনুমতি দেন না। আবার দু'জনের সাথে বিয়ে দিতেও আপত্তি করেন। এ ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি?

মাওলানার জবাব ঃ

ان دوتوام لڑکیوں کے معاملہ میں چار صورتیں ممکن ہیں - ایك یہ کہ دونوں کانکاح دوالگ شخصوں سے کیاجائے اور دوسری یہ کہ ان سں سے کسی ایك کا نکاح ایك شخص سے کیا جائے اورد وسری محروم رکھی جائے تیسری یہ کہ دونوں کانکاح ایك ھی شخص سے کردیا جائے - چوتھی یہ کہ دونوں ھمیشہ نکاح سے محروم رھیں -

ان میں سے پہلی دوصورتیں توایسی صریح ناجائز، غیرمعقول اورناقابل عمل هیں که انکے حلاف کسی استدلال کی حاجت نهیں هے - اب ره جاتی هے اخری دوصورتیں،یه دونوں قابل عمل هیں - مگرایك صورت کے متعلق مقامی علماء کهتے هیں که یه جمع بین الاختین کی صورت هے جسے قرآن نے صریح طورپر حرام قراردیا هے اس لئے لامحاله آخری صورت پرہی عمل کرنا هوگا -

بظاهرعلماء کی یه بات صحیح معلوم هوتی هے - لیونکه دونوں لڑکیاں توأم بهنیں هیں - اورقرآن کا یه حکم صاف اور صریح هے که دوبهنوں کوبیك وقت نکاح میں جمع کرنا حرام هے - لیکن اس پر دوسوالات پیدا هوتے هیں

(۱)کیایه ظلم نهیں هے کهان لڑکیوں‌کودائمی تجرد پر مجبور کیا جائے اور یه ہمیشه کیلئے نکاح سے محروم رهیں- (۲) اور کیا قرآن کایه حکم واقعی اس مخصوص اورنادر حالت کیلئے هے جس میں یه دونوں لڑ کیاں پیدا ئشی طور پرمبتلا ہیں - میرا خیال یه هے که الله تعالی کایه فرمان اس مخصوص حالت کیلئے نهیں هے بلکه اس عام حالت کیلئے هے جس میں‌بهنوں کا وجود الگ الگ هو- اور وه ایك شخص کو جمع کرنے سے هی بیك وقت ایك هی نکاح میں جمع هو سکتی هیں، ورنه نهیں - الله تعالی کا قاعده یه هے که وه عام حالات کی لئے احکام بیان کرتا هے اور مخصوص، شاذ ونادر یاعسیرالوقوع حلات کو چهوڑدیتا هے - اس طرح کے حالات سے اگر سابقه پیش آئے تو تفقه کاتقاضا یه هے که عام حکم کوان پر جون کاتوں چسپاکرنیکے بجائے صورت حکم کو چهوڑ کر مقصد حکم کومناسب طریقه سے پورا کیا جائے -

(رسائل ومسائل حصه سوم)

এ মেয়ে দু'টির ব্যাপারে চারটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

এক. দু'জনের বিয়ে দুটি পৃথক পৃথক পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

দুই. তাদের একজনকে কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং অন্যজনকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

তিন. দু'জনের বিয়ে একজন পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

চার. দু'জনকে চিরকালের জন্য বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

এর মধ্যে প্রথম পন্থা দু'টি এমন সুস্পষ্ট অবৈধ, অযৌক্তিক ও অবাস্তব যে, এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। এখন শেষের পন্থা দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এ পন্থা দু'টি বাস্তবানুগ। কিন্তু এ দু'টির একটি পন্থা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, যেহেতু এর ফলে একই সময়ে দুই সহোদরাকে বিয়ে করা হয় এবং কোরআনে এটিকে হারাম করা হয়েছে, তাই অবশ্য সর্বশেষ পন্থাটিকে কার্যকরী করতে হবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ওলামায়ে কিরামের এ কথাটি যথার্থ মনে হয়। কারণ মেয়ে দু'টি যমজ বোন এবং কোরআনে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন ভাষায় একই সময়ে দুই বোনকে বিয়ে করা হারাম গণ্য কার হয়েছে। কিন্তু এখানে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়।

এক. এ মেয়ে দু'টিকে চিরকাল যৌন সম্পর্ক রহিত এবং বিয়ে থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করা কি জুলুম নয়? দুই, এ দু'টি মেয়ে জন্মগতভাবে যে বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার সাথে জড়িত, কোরআনের এ হুকুমটি কি সত্যিই তাদের সাথে সম্পৃক্ত?

আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার এ ফরমানটি এ বিশেষ অবস্থাটির জন্যে নয়, বরং যে সাধারণ অবস্থায় দু'টি বোন আলাদাভাবে জন্মগ্রহণ করে সেই অবস্থার জন্যে এ ফরমানটি প্রদত্ত হয়েছে। এবং সাধারণ অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি একই সময় দু'সহোদরাকে বিয়ে করে তাহলে এ নির্দেশটি অমান্য করা হবে, নতুবা নয়। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হচ্ছে, তিনি সাধারণ অবস্থার জন্যে নির্দেশ দান করেন এবং বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যে নির্দেশ না দিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হলে সাধারণ নির্দেশকে অবিকল তার উপর প্রয়োগ করার পরিবর্তে নির্দেশের রূপকল্পটি বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যকে সঙ্গত পদ্ধতিতে পূর্ণ করাই ফিকহী জ্ঞানের পরিচায়ক। (রাসায়েল-মাসায়েল)

এ হলো মাওলানার দু'বোনকে একসাথে বিয়ে করার কথা। মাওলানা কখন এবং কোন্ অবস্থায় দু'বোনকে একসাথে বিয়ে করার প্রতি তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে মিথ্যাবাদীরা সাধারণ মানুষকে এ কথাই বুঝাতে চায় যে, মাওলানা সর্বাবস্থায়ই দু'বোনকে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দেন। তাদের মধ্যে দীয়ানতদারী কতটুকু আছে এ থেকে প্রমাণিত হয়।

মনগড়া তাফসীর করার অপবাদ

অপবাদকারীদের আরও একটি অপবাদ হল, মাওলানা নাকি

- تفسير بالراى বা মনগড়া তাফসীরকে জায়েয মনে করেন। অপবাদকারীরা তাদের দাবির সমর্থনে মাওলানার তিনটি উক্তি পেশ করেন ঃ

১. কোরআন পড়ে আমি যা বুঝেছি, আমার মনে যে প্রভাব পড়েছে যথাসাধ্য অবিকল তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

২. এ শিক্ষাপদ্ধতি বদলাতে হবে, কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সবার আগে, কিন্তু তাফসীর-হাদিসের পুরাতন ভাণ্ডার হতে নয়। এর শিক্ষাদানকারীকে এমন হতে হবে যিনি কোরআন-হাদিসের মগজ বা সারবস্তু লাভ করতে পেরেছেন।

৩. কোরআনের জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই। একজন উচ্চস্তরের প্রফেসরই যথেষ্ট, যিনি গভীর দৃষ্টিতে কোরআন পড়েছেন এবং যিনি নতুন ধরনের কোরআন পড়ানোর ও বুঝানোর যোগ্যতা রাখেন, তিনি তার লেকচার দ্বারা ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রদের মধ্যে কোরআন বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেন।

(দেখুন, মওদূদী ফিতনা ও মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম)

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! আপনারাও হয়ত মাওলানার উক্তিগুলো দেখে চমকে উঠেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার জানার পর আশা করি আপনাদের এ ভাব দূর হয়ে যাবে। আমি ধারাবাহিকভাবে তিনটি উক্তির আসল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করছি ঃ

১) প্রথমতঃ একথা বলা প্রয়োজন যে, মাওলানার তিনটি উক্তিই তার পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে বর্ণনা করে অপবাদকারীরা তাদের নিজ স্বার্থে মনগড়া বিকৃত অর্থ গ্রহণ করছে। উক্ত ১নং উক্তিটি মাওলানা তাঁর তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় কোরআন শরীফের তরজমা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন। এর পূর্বাপর সম্পর্ক জোড়ালে যে রূপ ধারণ করে তা নিম্নরূপ ঃ

میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کرآزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے - اس کیوجہ یہ نہیں ہےکہ میں پابندی لفظ کے ساتہ قرآن مجیدکا ترجمہ کرنیکوغلط سمجھتا ہوں - بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ترجمہ قرآن کاتعلق ہے ، یہ خدمت اس سے پہلے متعددبزرگ بہترین طریقہ

پرانجام دے چکے ھیں اوراس راہ میں اب کسی مزید کوشش:
کیضرورت باقی نہیں رہی ھے - فارسی میں حضرت شاہ ولی اللہ
صاحب رح کاترجمہ اور اردومیں شاہ عبدالقادر صاحب شاہ رفیع
الدین صاحب مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی
صاحب اور حافظ فتح محمد جالند ھري صاحب کے تراجم ان
اغراض کوبخوبی پورا کردیتے ھیں جن کیلئے ایك لفظی ترجمہ
درکا ھوتا ہے - لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ھیں جو لفظی ترجمے
سے پوری نہیں ھوتیں اور نہیں ھو سکتیں - انہیں کو میں نے
ترجمانی کی ذریعہ سے پوراکرنیکی کوشش کی ھے -

اسکے بعدمولانالفظی ترجمے کا کچھ نقص اورترجمانی کے
فائدے بیان کر تے عوئے لکھتے میں :

لفظی ترجمے کے طریقے میںکسر وحامی کے یھی وہ پھلو ہیں
جن کی تلافی کرنے کیلئے میں نے "ترجمانی" کاڈھنگ اختیار
کیاھے - میں نے اس میں قرآن کے الفاظ کواردوکاجامہ پھنا نے
کے بجائے یہ کوشش کي ھے کہ قرآن کا ایك عبارت کو بڑہ
کرجومفھوم میری سمجھ میں آتاھے اور جواثرمیرے دل میں
پڑتاھے حتی لامکان صحت کے ساتہ اپنی زبان میں منتقل کردوں -
(دیباچہ تفھیم القرآن)

আমি এ কিতাবে সাধারণ তরজমার রীতি পরিত্যাগ করে স্বাধীন স্বাচ্ছন্দভাবে ভাবার্থ প্রকাশের নীতি গ্রহণ করেছি। এর কারণ এটা নয় যে, আমি শব্দভিত্তিক তরজমাকে ভুল মনে করি। বরং এর আসল কারণ এই যে, ইতিপূর্বে বিভিন্ন বুজুর্গ ব্যক্তি এ খেদমত সূচারুরূপে আন্জাম দিয়েছেন। এ পথে আর চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই। ফারসীতে হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেবের তরজমা, উর্দুতে শাহ্ আবদুল কাদির সাহেব, শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেব, মাওলানা মাহমুদুল

হাসান সাহেব, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব এবং হাফিজ ফতেহ মোহাম্মদ জালন্দরী সাহেবের তরজমা ঐ উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে পূর্ণ করে দেয়, যার জন্য শব্দভিত্তিক তরজমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু প্রয়োজন এমন আছে যেগুলো শব্দভিত্তিক তরজমা দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

এরপর মাওলানা শব্দভিত্তিক তরজমার কিছু ত্রুটি ও ভাবার্থের ফায়দা বর্ণনা করে লেখেন ঃ

শব্দভিত্তিক তরজমার ঐ ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য আমি ভাবার্থের রীতি গ্রহণ করেছি। আমি এতে কোরআনের শব্দগুলোকে উর্দুর পরিচ্ছেদ বা শাব্দিক উর্দু বলার পরিবর্তে এ চেষ্টা করেছি যে, কোরআনের একটি অংশ পড়ে যে অর্থ আমার বুঝে আসে এবং যে প্রভাব আমার অন্তরে পড়ে, যথাসাধ্য সঠিকভাবে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করি। (ভূমিকা, তাফহীমুল কোরআন)

এর একটু পরেই মাওলানা লেখেন ঃ

"اسطرح کے آزادترجمے کیلئے یہ توبہرحال ناگزیرتھا کہ لفظی پابندیوں سے نکل کرادائے مطالب کی جسارت کی جائے ۔ لیکن معاملہ کلام الھی کاتھا - اسلئے میں نے بہت ڈرتے ھی آزادی برتی ھے - جس حدتك احتیاط میرے امکان میں تھی، اسکوملحوظ رکھتے ھوئے میں نے اس امرکا پورا اھتمام کیاھے کہ قرآن اپنی عبارت جتنی ازادی بیان کی گنجائش دیتی ھے اس سے تجاوز نہ ھونے پائے "-

(دیباچہ تفھیم القرآن)

এরকম স্বাধীন অনুবাদের জন্য শব্দভিত্তিক তরজমার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সারমর্ম প্রকাশের সাহস করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু ব্যাপার হল আল্লাহর কালামের। ঐ জন্য আমি অনেক ভয়ে ভয়ে এ স্বাধীনতা অবলম্বন করি। যতটুকু সাবধানতা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, এর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি পূর্ণ চেষ্টা করেছি যে, কোরআন শরীফের আয়াত যতটুকু স্বাধীনতার সুযোগ দেয়, এর সীমা যেন অতিক্রান্ত না হয়।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! বলেন তো মাওলানা কি বলেছেন, আর তাঁর বিরোধীরা কি বিকৃত অর্থ প্রকাশ করেছে! সবচেয়ে অবাক লাগে মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ)-এর মত মানুষ যখন মাওলানার উল্লেখিত উক্তিকে তাঁর মনগড়া তাফসীরের দলিল স্বরূপ পেশ করেন। দীয়ানতদারী আর কোথায় পাওয়া যাবে?

২) দুই এবং তিন নম্বর উক্তি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, উক্ত দু'টি উক্তি মাওলানা মওদূদী ১৯৩৬ ইং সনে আলীগড় ইউনিভার্সিটির শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে লিখেছিলেন, কোন দ্বীনি মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নয়।

মাওলানা তাঁর প্রবন্ধে ইউনিভার্সিটির সদস্যগণকে পরিষ্কারভাবে অবগত করেছিলেন যে, মুসলিম ইউনিভার্সিটির যে সাময়িক উদ্দেশ্য স্যার সাইয়েদের সময় রাখা হয়েছিল, এটাকে নিয়ে চলা সংগত নয়। আমাদের এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা এ্যাংলো মোহামেডান মুসলমানের প্রয়োজন নেই।

এরপর তিনি একথা বলার চেষ্টা করেছেন যে, যদি প্রকৃত পক্ষে এ অবস্থার পরিবর্তন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অনিষ্টতার সঠিক কারণ জানুন যাতে এর থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

মাওলানা এ কথাও পরিষ্কার করেছেন যে, নতুন শিক্ষা ও সভ্যতার প্রকৃতি ও তার স্বভাবের উপর চিন্তা করলে এ সত্য পরিষ্কার হয় যে, এটা ইসলামের প্রকৃতি ও স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি এটাকে আমরা আগাগোড়া গ্রহণ করে আমাদের নতুন বংশধরদের মধ্যে বিস্তার করি তাহলে এদেরকে আমরা চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলব।

এ কথাগুলো বলার পরই মাওলানা লিখেছেন ঃ

تو سب سے پہلے مغربی علوم وفنون کی تعلیم پرنظرثانی
کیجئے - ان علوم کا جوں کاجوں لینا ہی درست نہیں - طالب
علمونکی لوح سادہ پراسن وع کی تعلیم کا نقش اس طرح مرتسم
ہو ناھے کہ وہ مغربی چیزپر ایمان لا تے چلے جاتے ھیں - تنقید
کی صلاحیت ان میں پیدا نہیں ہوتی اوراگر پیدا ہوتی بھی ھے

توفی هزارایك طالب علم میں فارغ التحصیل هونیکےبعدسالہا سالکے گہرے مطالعه سے جبکه وہ زندگی کے آخری مرحلوں پر پہنچ جاتا هے اور کسی کام کے قابل نه یں رهتا - اس طرز تعلیم کو بد لنا چا ہیئے، تما ممغربی علوم کوطلبه کے سا منے تنقبد کے سا تهہ پیش کیجیئے اوریه تنقید خالص اسلامی نظریه سے هو - تاکه وہ ہر هر قوم پران کے ناقص اجزاء کو چھوڑتے جائیں - اور صرف کا رآمدحصوں کو لیتے جائیں - اسکے ساتھ علوم اسلامیه کو بھی قدی یم کتابوسے جوں کاتوں نه لیجیئے - بلکه ان میں سے بھي متأخرین کی آمیز شوں کو الگ کرکے اسلام کے دائمی اصول اور حقیفی اعتقادات اور غیر متبدل قوائین لیجیئے - ان کی اصلی اسپرٹ دلوں میں اتاریئے - اوران کا صحیح تدبر دماغوں میں پیدا کیجیئے - اس غرض کیلئے اپ کو بنا بنایا نصاب کہیں ملیگا - هر چیزاز سرنوبنا نی هوگی - قرآن وسنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم هے مگر تفسیر وحدیث کے پرانے ذخیرون سے نیں - انکے پرھانیوالے ایسے هونے چاهئیں جو قرآن وسنت کے مغزکوپاچکے هوں - اسلامی قانوں کی تعلیم بھی ضروری هے - مگر یهاںبھی پرانی کتابیں کام نه دین گے - آپکو معاشیات کی تعلیم میں اسلامی معیشت کے اصول قانوں کی تعلیم میں اسلامی قانونکے مبادی فلسفے کی تعلیم میں حکمت اسلامیه کے تطریات، تاریخ کی تعلیم میں اسلاى عنصرکوایك غالب اور حکمران عنصرکیحیثیت سے داخل کرنا هوگیا -

(تنقیحات)

'যদি প্রকৃতপক্ষে আলীগড় ইউনিভার্সিটিকে মুসলিমম ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করতে হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার উপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দিন। এ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবিকলভাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এ ধরনের শিক্ষার চিত্র ছাত্রদের অন্তরে এমনভাবে অংকিত হয় যে, তারা পাশ্চাত্যের সকল জিনিসের উপর বিশ্বাস করে বসে। যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আর হলেও হাজারে একজনের হয়। তা-ও ছাত্রজীবন শেষ করার পর বৎসরের পর বৎসর গভীরভাবে অধ্যয়নের পর যখন সে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। তখন তার কোন কাজের যোগ্যতা থাকে না। শিক্ষার এ পদ্ধতিকে বদলানো উচিত। সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ছাত্রদের সামনে সমালোচনা সহকারে পেশ করুন। আর এ সমালোচনাও নির্ভেজাল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে হওয়া উচিত– যাতে ছাত্ররা তাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে এর ত্রূটিপূর্ণ অংশকে ছাড়তে থাকে এবং উপকারী অংশকে গ্রহণ করতে থাকে। এর সাথে ইসলামী শিক্ষা ও পুরাতন কিতাবসমূহ থেকে অবিকল গ্রহণ না করে বরং পরবর্তীকালের ওলামাদের মিশ্রণকে আলাদা করে ইসলামের চিরস্থায়ী মূলনীতি, প্রকৃতি, এতেকাদসমূহ এবং অপরিবর্তনশীল আইনসমূহকে গ্রহণ করুন। এর আসল উদ্দেশ্য ও সঠিক চিন্তা মন-মস্তিষ্কে সৃষ্টি করুন।

এ উদ্দেশ্য পূরণার্থে আপনাদেরকে কোথাও কোন তৈরী সিলেবাস মিলবে না। বরং একেবারে নতুন করে তৈরি করতে হবে। কোরআন ও সুন্নাতে রাসূলের শিক্ষা সব শিক্ষার উপরে। কিন্তু তাফসীর ও হাদিসের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে নয়। এর শিক্ষাদানকারী এমন হওয়া উচিত যারা কোরআন ও হাদিসের সারাংশকে পেয়েছেন। ইসলামী আইনের শিক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুরাতন কিতাবসমূহ কাজ দিবে না। আপনাদেরকে অর্থনীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি,ফিলসফি শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গি, আইন শিক্ষার দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইনের সূচনা, ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী উপাদানগুলোকে এক প্রভাবশালী বাদশাহ হিসেবে প্রবেশ করাতে হবে। (তানকীহাত)

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, 'শিক্ষার এ পদ্ধতিকে বদলানো উচিত' কথাটি এবং 'কোরআন ও সুন্নাতে রাসূলের শিক্ষা সবার উপরে' এ কথাগুলোর মধ্যে কত দূরত্ব। কিন্তু মিথ্যা অপবাদ দানকারীরা মধ্যখানের দূরত্ব সরিয়ে এক করে ফেলেছে । ফলে অর্থের দিক দিয়ে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। যাক, আমি এবার মাওলানার ৩ নং উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছি ।

মাওলানা তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধ প্রকাশের পর অনুভব করলেন যে, শুধুমাত্র কয়েকটি ইশারায় কাজ হবে না। তাই তিনি এটাকে বিস্তারিতভাবে লিখে মাসিক তর্জমানুল কোরআনে প্রকাশ করেন। এতে তিনটি অংশ ছিল। প্রথমাংশে তিনি ইউনিভার্সিটির বর্তমান পলিসির সমালোচনা করে এর প্রধান প্রধান ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখ তরেন। দ্বিতীয়াংশে সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করেন। তৃতীয়াংশে এ প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত করার পন্থার উপর আলোচনা করেন।

মাওলানার তৃতীয় উক্তিটি বিরোধী মহল এর তৃতীয়াংশ থেকে গ্রহণ করেছেন। মাওলানা তাঁর এ তৃতীয়াংশে লেখেন 'কলেজের জন্য আমি যে সাধারণ সিলেবাসের প্রস্তাব পেশ করেছি এর তিনটি অংশ ঃ

ক) আরবী খ) কোরআন গ) ইসলামী শিক্ষা। এর মধ্যে আপনারা আরবীকে দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষায় মর্যাদা দিন। অন্যান্য ভাষা ছাত্ররা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা করতে পারে। কিন্তু কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজীর পরে অন্যান্য যে ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়, ওগুলো বন্ধ করে একমাত্র আরবী ভাষা শিক্ষা দিন। যদি সিলেবাস ভাল এবং শিক্ষকরা অভিজ্ঞ হন, তাহলে মাধ্যমিক স্তরের দু'বৎসরেই ছাত্রদের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করা যায় যে, তারা বি, এ-তে পৌছে কোরআনের শিক্ষা কোরআনের ভাষাতেই লাভ করতে পারে।'

এর পরেই মাওলানা লেখেন ঃ

قرآنکیلئے کسی تفسیرکی حاجت نہیں ایك اعلی درجه کا پر وفیسرکا فی ھے جس نے قران کا بنظر غائر مطألعه کیا ھواور جوطرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھا نے کی اھلیت رکھتا ھو وہ اپنے لکچروں سے انڑ میڑیٹ میں طلبه کے اندر قرآن فہمی کے ضروری استعدادپیدا کر یگا - پھربی رائے میں انکوپورا قرآن اسطرح پڑھا دیگا که وہ عربیت میںبھی کافی ترقی کرجائینگے اور اسلام کیروح سے بھی بخوبی واقف ھوجائینگے - (تنقیحات)

কোরআনের জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই, একজন উচ্চস্তরের প্রফেসরই যথেষ্ট– যিনি গভীর দৃষ্টিতে কোরআন অধ্যয়ন করেছেন এবং যিনি নতুন পদ্ধতিতে কোরআন পড়াবার ও বুঝাবার যোগ্যতা রাখেন। তিনি তার লেকচার দ্বারা

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে কোরআন বুঝাবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করবেন। এরপর বি, এ ক্লাসে তাদেরকে কোরআন এমনভাবে পড়িয়ে দিবেন যে, তারা আরবীতে যথেষ্ট উন্নতি করার সাথে সাথে ইসলামের মূল তত্ত্ব সম্পর্কেও অবগত হবে। (তানকীহাত)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মাওলানার উল্লেখিত তিনটি উক্তি পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপন করে পড়ুন এবং ইনসাফের সাথে বলুন মাওলানার কোন্ কথার দ্বারা তার উপর মনগড়া তাফসীরের অপবাদ দেয়া যায়! মাওলানা তাঁর আলোচনায় সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের মাধ্যমে কিভাবে কলেজ-ইউনির্ভাসিটির ছাত্রদের মধ্যে কোরআন-হাদিস বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা যায়, তাই বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাদের বক্রতাকে সোজা করে দিন, এ দো'আই করি।

মাওলানা তাঁর এ বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে দেন, যখন তাঁর বক্তব্যের উপর এক ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্ন পাঠান। মাওলানা উত্তরে বলেন ঃ

میں آپکا بہت شکرگزار ہوں کہ میری جن عبارات سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوتھا ان کا مفہوم آپنے خود مجھ ہی سے دریافت فرمالیا - اہل حق کا یہی طریقہ ہے کہ قائل کی مرادپہلے قائل ہی سے پوچھی جائے - نہ یہ کہ خودایك مطلب لیکراسپر فتوی جڑ دیاجائے - عبارت نمبر ۱، ۲سے میری مراد کیا ہے اسکوسمجھنے میں آپ کو اور آپ جیسے دوسرے لوگوں کو جودقت پیش آئی ہے اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیوں اورکالجوں کے ماحول سے انکی نصاب تعلیم سے اور انکے اندرگمراہیی کی پیدائش کے بنیادی اسباب سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں - آپ لوگ ان درسگا ہوں کواپنے دینی مدارس پرقیاس کر تے ہیں اورسمجھ لیتے ہیں کہ جسطرح آپ کے مدرسوں میں کوئ مولوی صاحب آسانی سے بیضاوی اوز جلالین اورترمذی پڑھالیتے ہیں اسی طرح ان کالجوں میں بھی پڑھا سکتے ہیں -

اسیلئیے آپ کومیری بات انوکھی معلوم هوئی که میں تفسیر وحدیث کے پرانے ذخیروں کے بجائیے ان کاکوئی بدل ان کالجوں کیلئیے تجویز کررہا هوں - لیکن میں آپ کے دینی مدارس کیطرح ان کالجوں اوریونیورسٹیوں سے واقف هوں - مجھے معلوم هے که وهاں کس قسم کا ذهنی ماخولپایاجاتاهے - اور ان کے طلبه کی افکار ونظریات کی آب وهوامیں نشو ونماپاتے هیں - میں نے خود انکی کتابوں کوپڑھا هے جو مذهبی تخیل کی جڑوں تك کوانسانوں کے ذهن سے اکھاڑ پھینکتی هیں - اورسراسرایك ملحدانه نظریه کائنات انسان اسطرح آدمی کے ذهن میں بٹھا دیتی هیں که آدمی اسے بالکل ایك معقول نظری سمجھنے لگتاهے - میں نے تفسیرقرآن اور شرح حدیث اور فقه کی پرانی کتابوں کو پڑھا هے اور مجھے معلوم هے که جدید زمانے کے علوم پڑھنے والے لوگوں کے ذهن میں شکوك وشبه اتکے جوکانتے چبھے هوئے هیں صرف یهی نهیں که ان کتابوں میں ان کونکال دینے کاکوئی سامان نهیں هے بلکه ان میں قدم قدم پروه چیزین ملتی هیں جو نئے تعلیم یافته لوگوں کےلئیے مزید شبهات پیدا کردینے والی هیں اور بسااوقات ان کی وجه سے مشکك شك کے مقام سے آگے بڑھکرجحودوانکار کے مقام تك پهخ جاتا هے مجھے یه بھی معلوم هے که ان جدید درسگاهوں میں پرانے طرزکے معلم دینیات اپنے پرانے طریقوں اورذخیروں سے دین کی تعلیم دیکراسکے سوا کوئی خدمت انجام نه دے سکے که خود بهی مضحکه بنے اور دین کا بهی استخفاف کرایا یه ساری چیز ین میری نگا میں هیں - اس بناپر میں یه رائے رکھتاهوں که ان دوسگا هوں کے لئےجب تك قرآن

کی ایسی تفسیرین اور احادیث کی ایسی شرحیں تیارنہ ھوجا نے
جن مین ان تمام سوالات کا جواب مل سکتا ھو جونئے زمانے کے
علوم پڑھنے والوں کے دلوں میں پیدا ھو تے ہیں - اس وقت تك
کوئی خاص کتاب داخل نصاب نہ کی جائے بلکہ ئلاش کر کے
ایسے استاد رکھے جائیں جو قرآن اور حدیث میں گھری بصیرت
رکھتے ھوں اور علوم جدیدہ سے بھی واقف ھوں اور وہ تفسیر کی
کوئی کتاب پڑھانے کے بجائے براہ راست قرآن کادرس دیں - اور
حدیث کي کوئ شرح پڑھانے کے بجائے براہ راست احادیث نبوی کی
تعلیم دیں تاکہ طلبہ کوان بحثوں سے سابقہ ھي پیش نہ آئے
جوانکے لئے ابتداء موجب توحش ھوا کرتی ھیں -

(ترجمان القرآن مارج ٥٢)

আমি কৃতজ্ঞ যে, আমার যে বাক্যগুলো আপনার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর অর্থ আপনি স্বয়ং আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন। সত্যপন্থীদের এটাই নিয়ম যে, বক্তার কোন কথার উদ্দেশ্য প্রথমে বক্তার কাছে জিজ্ঞেস করা। এটা নয় যে, নিজে একটা অর্থ নিয়ে এর উপর ফতোয়া দিয়ে দেয়া।

এক এবং দুই নম্বর উক্তিতে আমার উদ্দেশ্য কি এটা বুঝতে আপনার এবং আপনার মত অন্যদের যে অসুবিধা হয়েছে, এর আসল কারণ হল আপনারা ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের অবস্থা, সিলেবাস এবং ওগুলোর ভিতর নানা গুমরাহী জন্ম নেয়ার মূল কারণ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নন। আপনারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বীনি মাদ্রাসার মতো অনুমান করেন এবং এটা বুঝেন যে, যেভাবে মাদ্রাসাসমূহে কোন মাওলানা সাহেব বয়জাবী, জালালাইন এবং তিরমিজী পড়ান তেমনিভাবে কলেজেও পড়াতে পারবেন। এর জন্য আমার কথাগুলো নতুন ধরনের মনে হয়েছে যে, আমি তাফসীর ও হাদিসের পুরাতন ভান্ডারের পরিবর্তে অন্য কিছু এ কলেজগুলোর জন্য নির্ধারিত করছি। কিন্তু আমি আপনাদের দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহের মত এই কলেজ ও ইউনিভার্সিটিসমূহের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমার জানা আছে ওগুলোর চারপাশে কি ধরনের চিন্তা বিরাজ করছে, ছাত্রদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়। আমি নিজে তাদের বই

পড়েছি, যেগুলো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মূল পর্যন্ত মানুষের অন্তর থেকে উপড়িয়ে ফেলে। এমন এক কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে বসিয়ে দেয় যেটাকে মানুষ এক যর্থাথ মনে করতে থাকে। আমি কোরআন শরীফের তাফসীর, হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ফেকাহর পুরাতন কিতাবসমূহ পড়েছি। আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে যে সমস্ত সন্দেহের কাঁটা গেথে আছে, তা আমার জানা আছে। এ সমস্ত কিতাবে তাদের সন্দেহ দূর করার কোন সাজসরঞ্জাম নেই। বরং ওগুলোতে প্রতি পদক্ষেপে ঐ সমস্ত জিনিসই মেলে যেগুলো আধুনিক শিক্ষিতদের সন্দেহকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। এ কারণে অনেক সময় একজন সন্দেহকারী তার সন্দেহের অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়ে অস্বীকারের অবস্থান পর্যন্ত পৌছে যায়।

আমার এটাও জানা আছে, ঐ সমস্ত আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষক পুরাতন ভাণ্ডার থেকে পুরাতন পদ্ধতিতে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে নিজে হাসির পাত্র এবং দ্বীনকে হেয় করা ছাড়া অন্য কোন খেদমত আনজাম দিতে পারেন নাই। এসব কিছু আমার দৃষ্টিতে আছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ মত প্রকাশ করি যে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন শরীফের এমন তাফসীর এবং হাদিস শরীফের এমন ব্যাখা তৈরি না হবে, যেগুলোতে ঐ আধুনিক শিক্ষিতদের মনে সৃষ্ট প্রশ্নের জবাব না মিলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না করা। বরং অনুসন্ধান করে এমন শিক্ষক রাখা উচিত, যিনি কোরআন ও হাদিসে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তিনি তাফসীরের কোন কিতাব পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি কোরআনের দারস দিবেন এবং হাদিসের কোন শরাহ বা ব্যাখ্যা পড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি হাদিসে নবীর শিক্ষা দিবেন। যাতে ছাত্রদের ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীনই না হতে হয়, যেগুলো প্রথম থেকে তাদের অনীহার কারণ ছিল। (তর্জমানুল কোরআন, মার্চ ১৯৫২)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে, মাওলানা পুরাতন কিতাবসমূহের ভাণ্ডার ও পূর্বেকার মুজতাহিদীনদের ইজতেহাদকে অকেজো মনে করছেন। আসলে তা নয়। মাওলানা এ ব্যাপারে লেখেন ঃ

"بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تواٹل قانوں قراردیئی جا سکتے
ہیںاورنہ سب کے سب دربردکرینے کے لائق ہیں - صحیح
اورمعتدلمسلك یہی ہے کہ انمیں ردوبدل توکیاجاسکتا ہے
مگرصرف بقدرضرورت اوراسشرط کے ساتہ کہ جوردوبدل بہی کیا

جا   دوہ لوگ کریں جوعلم وبصیرت کے ساتہ جذبۃ
اتباع واطاعت بھی رکھتےھوں - رھے وہ لوگ جوزمانہ جدیدکے
رحجانات سے مغلوب ھوکردین میں - تحریف کرنا چاہتے ہیں
توان کے حق اجتہاد کو تسلیمکر نے سے ہمیں قطعی انکارھے -
(ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۵ ح)

পূর্বেকার বুজুর্গদের ইজতেহাদসমূহ এমন নয় যে, ওগুলো অটল কানুন, আর এমনও নয় যে সবগুলো সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার যোগ্য। সঠিক এবং মাধ্যম পন্থা এটাই যে, এতে রদবদল করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ এবং এই শর্তে যে, যতটুকু রদবদল করা হবে তা হবে একমাত্র শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে। তাছাড়া নতুন প্রয়োজনের জন্য নতুনভাবে ইজতেহাদ করা যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হল যে, ইজতেহাদের উৎস হতে হবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল। আর এ ইজতেহাদ ঐ সমস্ত মানুষ করবে যাদের গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকার সাথে সাথে অনুসরণ ও আনুগত্যের আবেগ আছে। আর ঐ সমস্ত মানুষ যারা নতুন যুগের আতিশয্যে প্রভাবিত হয়ে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করতে চায়, তাদের ইজতেহাদের অধিকার আমি কোনক্রমেই মানতে পারি না।

(তরজুমানুল কোরআন, ডিসেম্বর, ১৯৫০ ইং)

কোরআন শরীফের তাফসীরের ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

اب میں آپ کو قرآن وحدیث کی تفسیر وتشریخ کے معاملہ
میں ابنا نقطہ نظہ سمجھا نیکے لئے کچہ عرض کرتا ھوں -
میرے نزدیك قران مجید میں اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال
فرما ئے ھیں انکے ظاھری اور متبادرم فھومسے مجازی مفھوم کی
طرفپھ ھیرنا اسکے بغیر جائز نہیں ھے کہ ظاھری معنی لینے
کی کوئی گنجائش نہ پائی جاتی ھو اور مجازی مفھوم مرادلینے کے
سواکو ئی چارہ ہونے یانہ ھو نے کا فصلہ بھی میرکے نزدیك نہ
تواندھا دھند ھوسکتا ھے کہ جس لفظ کو ہم جہان جاہیں مجازی

معنی پہنادیں‌اور نہ یہ کسیکے انے یااسکی اپنی پسند یا اسکے اپنے قائم کئے ہوئے تصورات کي بناپرکیا جا سکتاھے - بلکہ اسکے لئے کوئی بنیادقرآن مجید ہی کے سیاق وسباق میں یا مسئلہ زیربحث کے بارے میں خود اسی کے دوسرے بیانات کے اندر پائی جانی چاہئے - کیونکہ یہ اللہ کا کلام ھے اوراللہ کا کلام ھی اسمرادکوسمجھنے کیلے بنیادبن سکتال ہے - اسی سے ہمیں یہ معلوم ھونا چاہیئے کہ کہاں کوئی لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ھوا ھے اور کہاں مجازی معنوی میں - اور مجازی معنی مرادہیں تو وہ کیا ھوسکتے ہیں جوقرآن کے استعمالکردہ لفظسے قریبترین مناسبت رکھتے ہوں

(مکاتیب - حصہ دوم - مکتوب نمبر ۲۵۰)

এখন আমি কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদেরকে বুঝানোর জন্য কিছু আরজ করছি। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা যে শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন, ওগুলোর প্রকাশ্য ও সহজে অনুমেয় অর্থ থেকে তার রূপক অর্থের দিকে ফিরা আমার নিকট এ ছাড়া জায়েয নয় যে, যদি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণেরর কোন অবকাশ এবং রূপক অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় না থাকে। তারপর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকা এবং না থাকা ও রূপক অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকা এবং না থাকা আমার নিকট চিন্তা গবেষণা ব্যতীত হতে পারে না। এমন নয় যে, আমার কোন শব্দের যেখানে এবং যেভাবে চাই একটা রূপক অর্থ গ্রহণ করে ফেলি। কিংবা কেউ নিজের খেয়াল-খুশি ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী একটা অর্থ গ্রহণ করে ফেলে। বরং এর জন্য কোরআন মজীদেরই ধারা বর্ণনার কিংবা কোরআন শরীফের এক অংশের সাথে অন্য অংশের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কে অথবা কোন আলোচিত মাসআলার অন্য কোন ব্যাপারে এ মাসআলারই বর্ণনার কোন ভিত্তি পাওয়া প্রয়োজনীয়। কেননা এটা আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র কালামই তার অর্থ বুঝানোর জন্য ভিত্তি হতে পারে। এ থেকে আমাদের এটা জানা উচিত যে, কোথায় কোন্ শব্দ হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে, আর কোথায় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা হতে পারে যেটা কোরআন শরীফে ব্যবহৃত শব্দের সাথে নিকটতম সম্পর্ক রাখে। (মাকাতীব, দ্বিতীয় খণ্ড, মকতুব নং ২৫০)

পাঠকবৃন্দ! কোরআন শরীফ সম্পর্কে যে ব্যক্তির এত উচ্চ ধারণা তার উপর মনগড়া তাফসীরের অপবাদ দেয়া জঘন্য জুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে?

চিল, শকুন, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি খাওয়া হালাল বলার অপবাদ

মাওলানার উপর আরেকটি অপবাদ হল তিনি নাকি চিল, শকুন, কুকুর, খেঁকশিয়াল, বিড়াল, কাক, সাপ ইত্যাদি জানোয়ার খাওয়া হালাল মনে করেন।

(দেখুন, মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম গ্রন্থে) (তর্জমানুল কোরআন রবিউস সানি সংখ্যা ১৩৬২ হিঃ থেকে উদ্ধৃতি)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ১৩৬২ হিজরীর তর্জমানুল কোরআন আমার হাতে নেই। অতএব এতে মাওলানা কি প্রসঙ্গে কি বলেছেন আমি জানি না। কিন্তু তাফহীমুল কোরআন প্রথম খণ্ড, সূরা মায়েদার আয়াতে احلت لكم بهيمة الا نعام এর তাফসীর প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম ঃ

نیزاس سے اشارة یہ بات بھی مترشح ھوتی ھے کہ وہ چوپائے جو مویشیون کے برعکس کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانروں کومارکرکھا تے ہوں حلال نہیں ھیں - اسی اشار ے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کےحدیث میں صاف حکم دیدیاکہ درندے حرام ھیں - اسی طرح حضور مو نے ان پرندوں کو بھی حرام قرارد یاجن کے پنجے ہوتے ہیں اور جودرسر ے جانوروں کاشکار کرکے کھاتے ہیں‌یامردارخوارھوتے ہیں - این عباس رضہ کی روایت ھے کہ - نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذي ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر" دوسرے متعددصحابہ سے بھی اسکی تائیدمیں روایات منقول ہیں- (تفہیم القران ج اصف ٤٣٧)

এ থেকে প্রসংগত এ-ও জানা গেল, যেসব চতুষ্পদ জন্তুর শিকারী দাঁত রয়েছে এবং অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার হত্যা করে ভক্ষণ করে, তা খাওয়া হালাল নয়। এটাকেই নবী (সাঃ) নিজ ভাষায় সুস্পষ্টরূপে বলেছেন যে, চূর্ণকারী ----জন্তু খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে যেসব জন্তু জানোয়ারের পাঞ্জা রয়েছে এবং অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করে ভক্ষণ করে কিংবা মৃত জন্তু-খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তা-ও নবী করিম (সাঃ)-এর ফয়সালা অনুযায়ী হারাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– 'নবী করিম (সাঃ) প্রত্যেক শিকারী দাঁতসম্পন্ন হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক পাঞ্জাধারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।' বিভিন্ন সাহাবী হতেও এর সমর্থনমূলক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

তাসাউফকে অস্বীকার করার অপবাদ

মাওলানার উপর অপবাদ, তিনি নাকি তাসাউফকে অস্বীকার করেন।

(দেখুন, মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম)

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! তাসাউফ সম্পর্কে মাওলানার কি দৃষ্টিভঙ্গি তা তাঁর নিচের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটাকে বলা হয় তাসাউফ। যেমন কেউ নামায পড়ছে, সেখানে ফিকাহ কেবলমাত্র এতটুকুই দেখছে যে, সে ঠিকমত ওযু করল কি না, কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কি না, নামাযের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কি না, নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়তে হয় তা সে পড়ল কি না এবং যে সময়ে যে কয় রাকায়াত নামায নির্ধারিত রয়েছে, ঠিক সে সময়ে তত রাকায়াত পড়ল কি না। যখন এর সবগুলো শর্ত পালন করা হল তখন ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাসাউফ দেখে যে, এ ইবাদতে তার দীলের অবস্থা কি ছিল? সে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্টচিত্তে ছিল কি না? তার দীল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কি না? নামায থেকে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভীতি, তাঁর হাজির নাজির থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় এবং একমাত্র তারই সন্তোষ বিধানের আকাঙক্ষা পয়দা হয়েছিল কি না? এ নামায তার আত্মাকে কতটুকু পরিশুদ্ধ করেছে? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে? তাকে কতটা সত্য সাধক ও সৎ কর্মশীল মুসলিম করে তুলেছে? নামাযের সত্যিকার লক্ষ্যের পথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে, একজন লোক তার যতটা পরিপূর্ণতা হাসিল করল,

তাসাউফের দৃষ্টিতে তার নামায ততটা বেশি পূর্ণতা লাভ করেছে। আর সেদিকে যতটা দুর্বলতা থেকে যাবে, তারই জন্য তার নামাযকেও ততটা দুর্বল বলে ধরা হবে। এমনি করে শরীয়তে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, তার সবকিছুতে ফিকাহ কেবল এতটুকু দেখে যে, যে হুকুম যেভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই হুকুম ঠিক সেই পদ্ধতিতে পালন করা হল কি না। অন্য দিকে তাসাউফ দেখে, সেই হুকুম পালনের ব্যাপারে তার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা, সৎ সংকল্প ও সত্যিকার আনুগত্যের মনোভাব বর্তমান ছিল।

একটি দৃষ্টান্ত থেকে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রতি নজর করে। এক হচ্ছে লোকটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবান কি না। অন্ধ, কানা, খোড়া তো নয়। লোকটি সুশ্রী না কুশ্রী বা তার পরিধানে ভাল কাপড়-চোপড় না ময়লা জীর্ণ কাপড়। দ্বিতীয় হচ্ছে, তার চরিত্র কি ধরনের, তার স্বভাব ও অভ্যাস কিরূপ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি কি প্রকারের, সে আলেম না জাহেল , সৎ না অসৎ। এর মধ্যে প্রথম নজরটি হচ্ছে ফিকাহ্‌র নজর, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাসাউফের নজর। বন্ধুত্বের জন্য যখন কেউ কোন লোককে পছন্দ করতে চেষ্টা করবে তখন তার ব্যক্তিত্বের দু'টি দিকই যাচাই করে দেখতে হবে। তার ভেতর ও বাইরের দু'টি দিকই সুন্দর হোক এ হবে তার আকাঙক্ষা। এমনি করে ইসলামেও যে বাঞ্ছিত জীবনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে বাইরের ও ভিতরের উভয়বিধ বিশ্বাসের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধি-বিধানের আনুগত্য করতে হবে। কোন ব্যক্তির বাইরের আনুগত্য আছে অথচ অন্তরের আনুগত্যের প্রাণবস্তু নেই, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুন্দর চেহারার মৃত ব্যক্তির মত। আবার যে ব্যক্তির কার্যকলাপে যাবতীয় সৌন্দর্য মজুদ রয়েছে, অথচ বাইরের আনুগত্য সঠিকভাবে করা হচ্ছে না, তার তুলনা চলে ঐ ব্যক্তির সাথে, যে অত্যন্ত শরীফ ও সৎ কর্মশীল অথচ শারীরিক দিক দিয়ে কুশ্রী ও বিকলাঙ্গ।

এ দৃষ্টান্ত থেকে ফিকাহ ও তাসাউফের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পরবর্তী জামানায় যেখানে জ্ঞান ও চরিত্রের বিকৃতি হেতু বহুবিদ অনাচার জন্মলাভ করেছে সেখানে তাসাউফের রূপকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বিভ্রান্ত জাতিসমূহের কাছ থেকে ইসলাম বিরোধী দর্শনের শিক্ষা লাভ করে মানুষ তাকে তাসাউফের নামে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে নিয়েছে। কোরআন ও হাদিসে যার অস্তিত্ব নেই, এমন বহু বিচিত্র ধরনে বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি

তারা তাসাউফের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে শরীয়তের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাদের মতে, তাসাউফের সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আর এক ভিন্নতর জগত বিরাজ করছে। সুফীদের জন্য আইন ও নিয়ম পদ্ধতির আনুগত্য করার প্রয়োজন কি? জাহেল সুফীরাই এ ধরনের মত পোষণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রসূত। শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না, ইসলামে এমন কোন তাসাউফের স্থান নেই। কোন সুফীর নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভের অধিকার নেই। সমাজ জীবন, নৈতিক দায়িত্ব, চরিত্র, পারস্পরিক আদান-প্রদান, অধিকার, কর্তব্য ও হালাল-হারামের সীমানা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন, কোন সুফীরই সেই নিয়মের বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার নেই। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করে না, মুসলিম সুফী বলে পরিচয় দেবার যোগ্য সে নয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেমই হচ্ছে তাসাউফ এবং প্রেমের দাবি হচ্ছে এই যে, কেউ যেন আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। ইসলামী তাসাউফ শরীয়ত থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয় বরং শরীয়তের বিধানসমূহে সর্বাধিক আন্তরিকতা ও সৎ সংকল্প সহকারে পালন করা এবং আনুগত্যের ভিতরে আল্লাহ্র প্রেম ও ভীতির মনোভাব সঞ্চার করার নামই হচ্ছে তাসাউফ।

(দেখুন, মাওলানা মওদূদী রচিত গ্রন্থ ঃ ইসলাম পরিচিতি)

সম্মানিত পাঠক! মাওলানা কত সুন্দর যুক্তি দিয়ে তাসাউফকে বুঝালেন, কিন্তু এরপরও তাঁর উপর তাসাউফ অস্বীকার করার অপবাদ দেয়া হচ্ছে। অন্যের উপর অপবাদ দেয়াকে বিরোধী মহল যেন কোন গোনাহের কাজই মনে করেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

ফেরেশতাদেরকে দেব-দেবী বলার অপবাদ

মাওলানা নাকি বলেছেন ঃ

ফেরেশতা প্রায় ঐ জিনিস যাকে গ্রীক, ভারত ইত্যাদি দেশের মোশরেকরা দেবী-দেবতা স্থির করেছে।

(মিষ্টার মওদূদীর নিউ ইসলাম পুস্তকে মাওলানার কিতাবের উদ্ধৃতি ঃ তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীন)

নবী এবং সাহাবাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করাকে জরুরী মনে করা

❑ নবী হোক, সাহাবা হোক, কারো সম্মানার্থে তার দোষ বর্ণনা না করাকে জরুরী মনে করা আমার দৃষ্টিতে মূর্তি পূজারই শামিল।

(মিষ্টার মওদূদী নতুন ইসলাম ঃ তর্জমানুল কোরআন ৩৫ সংখ্যা)

❑ মহানবী সাঃ) নিজে মনগড়া কথা বলেছেন এবং তিনি নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ করেছেন।

(মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম ঃ তর্জমানুল কোরআন, রবিঃ আউঃ সংখ্যা ১৩৬৫ হিঃ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দুর্বলমনা বলার অপবাদ

❑ হযরত আবু বকর (রাঃ) দুর্বলমনা ও খেলাফতের দায়িত্ব বহনে অযোগ্য ছিলেন। (মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম ঃ তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন)

নবী করিম (সাঃ)-এর আদত – আখলাককে সুন্নাত না বলার অপবাদ

❑ নবীয়ে করিম (সাঃ)-এর আদত-আখলাককে সুন্নাত বলা এবং তা অনুসরণে জোর দেয়া আমার মতে সাংঘাতিক ধরনের বিদআ'ত, মারাত্মক ধর্ম বিগড়ন। (মিষ্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম ঃ রাসায়েল-মাসায়েল)

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! মাওলানার যে যে কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, আপনাদের কারও কাছে ওগুলো থাকলে একটু কষ্ট করে খুলে দেখুন, তাহলে উল্লেখিত অভিযোগগুলো যে কত জঘন্য মিথ্যা তা সহজেই বুঝতে পারবেন। মাওলানার উপর মিথ্যা অপবাদের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলাম, সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি 'মিস্টার মওদূদীর নতুন ইসলাম' নামে একটি নিকৃষ্ট ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি যে আগাগোড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা তা মাওলানার বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়। সুতরাং মাওলানার বইয়ের সাথে না মিলিয়ে শুধুমাত্র উক্ত বই পড়ে কেউ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদিস অনুযায়ী মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিগণিত হবেন।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার কারণ

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এবং জামায়াতে ইসলামীর সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিরোধিতা করে থাকেন ঃ

১. ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায় ২. আলেম সম্প্রদায়ের একাংশ।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা অতি স্বাভাবিক। মাওলানা তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে যখন কুম্যুনিজম, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, মাওবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির অসারতা এবং ভণ্ডতা প্রমাণ করেন, তখন তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং তারা তাদের সর্বশক্তি ও বিরোধিতার সকল পন্থা নিয়োগ করে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। হক ও বাতিলের এ সংঘাত স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরামের বিরোধিতার পিছনে রয়েছে এক করুণ ইতিহাস।

১৯২৫ সালে মাওলানা যখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন জমিয়ত রাজনৈতিক অংগনে কংগ্রেসের অনুকূলে প্রচারণা চালানোর জন্য মাওলানার উপর চাপ সৃষ্টি করে। মাওলানা তা অস্বীকার করে পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন, যে কংগ্রেসী ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, তার অনুকূলে কোন কথা বলা কিংবা কোন প্রকার সহযোগিতা করা মুসলমানের জন্য অন্যায় এবং ইসলাম বিরোধী কাজ।

এতে কংগ্রেস পন্থী ওলামায়ে কেরাম মাওলানার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠেন। অতঃপর গান্ধীর One nation theory (একজাতি তত্ত্ব) এবং এর পক্ষে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) "متحده قوميت" (একজাতি তত্ত্ব) নামে একটি বই লিখে কায়েদে আজমের Two Nation Theory বা দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) "مسئله قوميت" বা 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে একটি বই লিখে কোরআন ও হাদিসের বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর মতকে ভুল প্রমাণিত করেন। ফলে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীসহ অন্যান্য কংগ্রেসী ওলামায়ে কেরাম যারা ইতিপূর্বে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, যারা তাকে مفكر اعظم বা শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ উপাধি দিয়েছিলেন, তারা মাওলানাকে পুনরায় পথভ্রষ্ট, ইসলামের দুশমন, এমনকি কাফির উপাধিতে ভূষিত করতে লাগলেন।

আমাদের দেশের বর্তমান বর্ষীয়াণ ওলামায়ে কেরামদের অধিকাংশ হয়ত হোসাইন আহমদ মাদানীর ছাত্র আর না হয় তার মুরীদ। সুতরাং তারা তাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদের অনুসরণই করলেন। এমনকি মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর কোন কথাকে যাচাই করে দেখাকে তারা রীতিমত গুনাহের কাজ মনে করেন। ছাত্র এবং শিক্ষকের ধারা যেহেতু চালু আছে, সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরোধিতার ধারাও আজ পর্যন্ত চালু আছে।
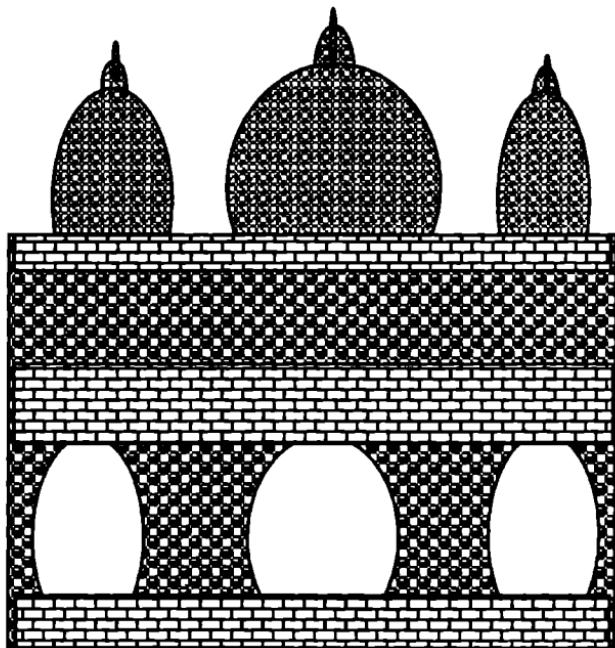
মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) তথা জামায়াতে ইসলামীর বই-পুস্তক সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের অভিমত

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক

আল্লামা ক্বারী তাইয়্যেব সাহেব

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম দেওবন্দ - এর অভিমত

(۱) مولانامودودی نے اسلامی اجتماعیات کے بارے میں نہایت مفید اور قابل قدرذخیرہ فراهم کیاھے - اس دورخلط واختلاط اورتلبیس والتباس میں جس بے جگری سے مولانا مودودی نے اسلامی اجتماعیات کاتجزیه اورتنقیح کرکے جماعتی مسائل کو صاف کیا ہے وہ انھی کاحصه هے - میں انہیں اسلامی اجتماعیات کاایك بہترین سیاسی مفکر سمجھتاھوں اور اجتماعیات کی حدتك انہیں ایك بہترین اسلامی لیزرمان کران کی تقریوں کوقدرکی نگاہ سے دیکھتا هوں -

(مولانا مودودی سے ملیئے - ازاسعدگیلانی)

(۲) اس جماعت کے اصول اجتماعی میں کوئی بات خلاف شریعت نظرنہیں آتی ۔ (رسالہ وار العلوم دیوبند - جون۱۰۵ ح)

(۳) محترم مولانامودودی صاحب نے مستقلااسي عنوان سے ایك ادارہ کی تشکیل کی - اس تحریك وتشکیل نے اجتماعیات اسلامی کی حدتك قوم کوکافی فائدہ پہنچایا اورانکے معقول

ومتیں طرزبیان نے اور طریق استدلا لنے ملك کے پڑھے لکھے طبفے کو عموما متآثر کیا ھے - بالخصوص انگریزی تعلیم یافتہ حلقہ جسکے سامنے اسلامی اجتماعیات کا کئی منصبط تصورھی نہ تھا ، اسلام کی اجتماعی زندگی، اورخالص دینی سیاست کے بہت قریب ھو گیاہے - جسکے لئے قوم کومرھون منت ھونا چاہئے

(فطری حکومت - قاری محمدطیب)

১. মাওলানা মওদূদী ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে অত্যন্ত উপাদেয় ও মূল্যবান সম্পদের সমাবেশ করেছেন। এ বিশৃঙ্খলা ও সংমিশ্রণের যোগে যে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় মাওলানা মওদূদী ইসলামী দর্শন সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছেন এটা তাঁরই কৃতিত্ব। আমি তাঁকে ইসলামী দর্শন সম্পর্কে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বলে মনে করি। এবং দর্শনের সীমা পর্যন্ত তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী নেতা মেনে নিয়ে তাঁর বক্তব্যসমূহ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি।

(মাওলানা আসআদ গিলানী প্রণিত 'মাওলানা মওদূদী সে মিলিয়ে')

২. জামায়াতে ইসলামীর মূলনীতিতে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা দৃষ্টিগোচর হয়নি। (রিসালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, জুন ১৯৫১ ইং)

৩. মোহতারাম মাওলানা মওদূদী সাহেব পৃথক এই শিরোনামেই আন্দোলন শুরু করেন এবং এ মূলনীতিতেই জামায়াতে ইসলামী নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এই আন্দোলন ও সংগঠন ইসলামী চিন্তাধারার সীমারেখা জাতির বিরাট উপকার সাধন করেছে। আর তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ় বর্ণনারীতি এবং যুক্তিনীতি দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ যাদের সামনে ইসলামী দর্শনের কোন সুষ্ঠু চিন্তাধারার ধারণাই ছিল না তারা এখন ইসলামী সমাজ জীবন ওদ্বীনি রাজনীতির অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। যার জন্য সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ স্বীকার করা আবশ্যক।

(ক্বারী মোঃ তাইয়েব সাহেব রচিত, ফিতরী হুকুমত দ্রষ্টব্য)

ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অভিমত

"مولاناابوالاعلی کي خدماتجليله سے امت مسلمه کبھی صرف نظر نہیں کر سکتی - که ایسے کارھا ئے نمایاں تاریخ تجدید اسلام کے ہر باب وفصل کے لئے سرمایة افتخازوبدرجه عنوان هیں -

مولانا گلشن حق کے ان لاله وسنبل میں سے ہیں جنگی خوشبو سد بہار ہمیشه تعفن باطل کو مغوب کرکے طالبان حق کے دل ودماغ کو معطرکرتی رہتی ھے اور جسے فنا نہیں

"ثبت است برجریده عالم دوام ما"

ابو الکلام

(مولانا مودودیسے ملیئے - از اسعد گیلانی)

'মাওলানা আবুল আ'লার বিরাট খেদমতকে মুসলিম মিল্লাত কখনও অস্বীকার করতে পারবে না যে, এমন উজ্জ্বল কার্যাবলী ইসলামী নবজাগরণ ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের জন্য গৌরবের বস্তু প্রচ্ছদপট সমতুল্য।

মাওলানা সত্যরূপ ফুলবাগানের ঐ সুগন্ধী ফুল সমতুল্য, যাদের সৌরভ সকল ঋতুতে বিরাজমান এবং সর্বদা বাতিলের দুর্গন্ধকে পরাভূত করে সত্যান্বেষীদের অন্তর ও মস্তিষ্ককে সুগন্ধময় করতে থাকে, আর যা কখনও ধ্বংস হয় না।'

(আসাদ গিলানী প্রণীত 'মাওলানা মওদূদী সে মিলিয়ে')

উপমহাদেশের গৌরব আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর অভিমত

مولانامودودیکااسلوب تحریر، محکم استدلال اصولیوبنیادی طریق بحث اورسب سے بڑھکران کی سلاست فکرهماری افتادطبع اورذهنی ساخت کے عین مطابق ھے، ایسامعلوم هوتا ھے که ان کاقلم اپنی خداداد قدرت وقابلیت کے ساته همارے بے زبان ذهن وذوق کی ترجما نی کررهاهے - وه وقت کبھین هیں بهوتلتاجب ندوه کے مہمان خانه کے سامنے جودارالعلوم کی مسجدکے پہلے میں

ھے ھم چند دوستوں نے محرم ٤٥٦ کے "ترجمان القران کے اشارات
پڑھرھے تھے ، جن میں آے نے والے طوفان کی خبر دیگتھی - یہ
مولانا مودودیہ کاوہ ولولہ انگیزمضمون تھاجس کی بازگشت
عرصة گسنی جات یرھی ھمسب لوگوںنے مولانا فراست ، خطرہ کي
نشاندھی اورقوت تحریر کی دل کھول کردادی-اسکے بعد مولانا
کے جومضامین شائع ہوتے رھے ہمارا ذھن وذوق انکواچھی طرح
ھضم کرتارہا - (مولانامودودی سے ملیئے - از اسعد گیلانی)

মাওলানা মওদূদীর রচনারীতি, সুদৃঢ় দলিল প্রদান, মৌলিক ও বুনিয়াদী যুক্তিরীতি এবং সর্বোপরী তাঁর সরল পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা আমাদের পতিত স্বভাব ও প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার অত্যন্ত উপযোগী, এবং তাকে এমনি মনে হয় যেন তাঁর কলম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ে আমাদের নির্বাক প্রতিভা ও চাহিদার ব্যাখ্যা করছে। আমি ঐ সময়ের কথা কখনও ভুলব না যখন আমরা কয়েক বন্ধু নদওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পার্শ্ববর্তী মেহমানখানার সামনে বসে মহররম ৫৬ হিজরীর 'তরজমানুল কোরআন'-এর ইশারাত পড়লাম, যাতে আগত ঝড়-ঝঞ্ঝার সংকেত প্রদান করা হয়েছিল। এটা ছিল মাওলানা মওদূদীর একটি বিস্ময়কর প্রবন্ধ যার গুঞ্জরণ বহুদিন যাবত শোনা যাচ্ছিল। আমরা সকলে মাওলানার বুদ্ধির প্রখরতা, সংকটের সঠিক নিরূপণ এবং লেখনীশক্তির মন খুলে প্রশংসা করলাম। এরপর মাওলানার সকল লেখনীর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হত আমরা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে সেগুলো পড়তাম।

(মাওলানা আসআ'দ গিলানী প্রণীত 'মাওলানা মওদূদী সে মিলিয়ে')

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখুল হাদিস আল্লামা মানাযির আহসান গিলানী ফাযেলে দেওবন্দের অভিমত

(۱) مولانا سید ابو الاعلی مودودي" انکی سلیم الفطرت،
متوازن دماغ اور گہری نظرپر مجھے ہمیشہ اعتمادرہا ھے - وہ
ایك خدادادسلیقے سے سرفراز ھیں - مسائل میں ان کی نظر
محیط اوربمہ گیرواقع ھوئی ھے - بحث کا مشکل سے ھی کوئی

ایسا پہل یو باقی رہ جاتا ہے جسے انکے قلم نے تشنہ چھوڑا ہو۔
ظرزادال نشیں، طریقۃ تعبیردل آئینہ، اشکے ساتہ ان کی فطرت
کی بلندی کی شہادت تو متعدد باراداکر چکاھوں خودخاکسارنے
مولانا عبد الباری کی فاقت میں مولانا موصوف سے جامعہ
عثمانیہ کی پروفیسری ایك دفعہ نہیں۔ بار بارتوجہدلائ -
لیکن جس قت انکے مالی ذرائع قریباصغر کی حیثیت رکھتے
تھے - اس وقت انتہائی خندہ پیشانی کے ساتہ مولانانے ہمارے اس
مشورے کو مستردفرما دیا -

غنا قلب کی مقام رفیع پرجو اپنے قدم استوا رکر چکا ھواور
ذھن ودماغی اور تحریری وانشائی حیثیت سے ان خدا داد
صلاحیتوں کا مالك ھو زیادہ عرضکرنیکی توجرآت نھی کر سکتا
- لیکن میں اتناعرض کردوں کہ حق تعالی نے مودودی کے ساتہ
جو غیر معمولی فیاضیاں فرمائ ھیں اور ایمان کی جوراسخ قسم
کی روشنی کم ازکم محجھے انکے سینے میں جھگمگائی ھوئی نظر
آتی ھے محمد رسول اللہ پر ھےلاگ اعتمادکی دولت سے وہ سر
فرازفرمائے گئے ھیں نیزاسی کے ساتہ مختلف قسم کی اچھی
اچھیقابلی توں کے شباب عالمین ان کے گردجمع ھوگئے ھیں - تمام
ایمانی ، علمی وذھنی قوتوں کے ساتھ الدعوت الی سبیل اللہ کو
نصب العین بناکر اگر وہ کھڑے ھو جائنیگے اور اردو، انگریری
ہندی زبانوں ھیں کچہ دن بھی کام کیاگیا تو ممکن ھے کر قبول
کر نے ھیں لوگی جلری نہ کریں لیکن اسلام جن فطری سوالوں
کاجواب ھے کم ازکم قلوبمیں ان سوالون کے شعلے توانشاء اللہ

تعالی بھڑك اٹھینگے - (مولانامودودی سے ملیئے - ازاسعدگیلانی)
(۲) شایدھی کوئ بدبخت مسلمان ھوگا جس کے دل سے مولانا مودودی صاحب کے ان بلیغ واثر انگیز اور دلدو زمضامیں پڑھکردعائیں نہ نکلتی ھوں - اواج بھی ایساکور نصیب ، کوتاہ بخت، سیاہ سینہ کون مسلمان ھوگا جس کے دل میں مولانا کی اس خالص قرآنی دعوت سے اختلاف کی جرآت ھوسکتی ھے -

(اخبارصدق - ۱۸ اگسٹ ۵۰ ع)

(১) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাঁর শান্ত স্বভাব, স্থির মস্তিষ্ক এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমার সব সময় বিশ্বাস আছে। তিনি এক আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভায় ভূষিত। কোন মাসআলার সমাধানে তাঁর চিন্তাধারা গভীর ও সর্বব্যাপী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোন বিষয়ের কোন দিক এমন নেই যে, যাতে তাঁর কলম চলেনি। বর্ণনারীতি হৃদয়স্পর্শী, ব্যাখ্যানীতি অন্তঃদর্পণ, এতদ্ব্যতীত তাঁর উচ্চ স্বভাবের সাক্ষ্য তো অনেকবার বর্ণনা করেছি। আমি স্বয়ং মাওলানা আবদুল বারীসহ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য একবার নয়, কয়েকবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বস্তুতঃ ঐ সময় তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা শূন্যের কোঠায় ছিল। ঐ সময়ও মাওলানা আমাদের পরামর্শকে অত্যন্ত হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মনোবলের উচ্চাসনে তিনি সমাসীন। প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা লিখন ও রচনারীতিতে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। অতিরিক্ত কিছু বলার সাহস করতে পারি না, কিন্তু আমি এতটুকু বলে দিতে চাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা মওদূদীর প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং ঈমানের সুদৃঢ় আলোকচ্ছটার আলো আমি তার বক্ষে চমকাতে দেখতে পাই। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর গভীর ও অটল বিশ্বাস তাঁর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক তরুণ যুবক তাঁর পার্শ্বে একত্রিত হয়েছে। সকল ঈমানী, জ্ঞানগত ও প্রতিভাগত শক্তিকে পাথেয় করে তিনি যদি আল্লাহ্র পথে আহবান প্রধান উদ্দেশ্য করে দাঁড়িয়ে যান এবং উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে যান, তাহলে মানুষ তা তাড়াতাড়ি গ্রহণ না করলেও ইসলাম যে সকল স্বভাবজাত প্রশ্নের জবাব, অন্ততঃ পক্ষে অন্তরে সে প্রশ্নগুলোর আলোকরশ্মি তো ইনশাআল্লাহ প্রজ্জ্বলিত হবেই।

(মাওলানা আস'আদ গিলানী প্রণীত 'মাওলানা মওদূদী সে মিলিয়ে')

(২) সম্ভবতঃ এরূপ দুর্ভাগা মুসলমান খুব কমই আছে, যার অন্তর মাওলানা মওদূদী সাহেবের ব্যাখ্যায় প্রভাব সৃষ্টিকারী ও হৃদয়স্পর্শী রচনাবলী পাঠ করে দো'আ করে না। এমন কোন দুর্ভাগ্য, হতভাগা ও হিংসুক মুসলমান নেই যার অন্তর মাওলানার এ খাঁটি কোরানী আহবানের বিরোধিতা করার দুঃসাহস করতে পারে?

(আখবারে সিদক, ১০ই জুলাই, আগস্ট ১৯৫০ ইং)

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন আল্লামা সোলায়মান নদভীর অভিমত

میں اسوقت ایك نوجوان لیکن ایك بحرذ خارکاتعارف آپ حضرات کے سامنے کر انیکے لئے کھڑاھواھوں - مولانا مودودی صاحب سے علمی دنیا پورے طور پرواقف ہوچکی ھے اوریہ حقیقت ھے کہ آپ اس دور کے متکلم اسلام اور ایك بلندھا ایہ عالم ہیں - یوروپ سے الحاد ودھریت کاجوسیلاب ھندوستان میں آیا تھا قدرت نے اسکے سا منے بندباندھنے کا انتظام بھی ایسے ھے مقدس اور پك طینت ھتھوں سے کرایا جوخودیوروپ کے جدید وقدیم خیالات سے نہایت اعلی طور پرکماحقہ واقفیت رکھتا ھے- پھر اسکے ساتہ ھی قرآن وسنت کا اتنا گھرا اور ،تضح ھلم وکھتا ھے کہ موجودہ دورکے تمام مسائل پراسکیروشنی میں تسلی بخش طور پر گفتگوکر سکتا ھے - یھی وجہ ھے کہ بڑے بڑے ملحمددں اور دھریوں نے اس شخص کے دلائل کے سامنے ذگیں ڈال دیں - اور یہ بات واضح طوربر کھی جاسکتی ھے کہ مودودی صاحب سے ھندوستان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہت سی توقعات دینی وابستہ ھیں -

(مولانا مودودی سے ملیئیے " اسعد گیلانی)

আমি এখন একজন যুবক। কিন্তু এক গভীর সমুদ্রের পরিচিতি দেয়ার জন্য আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। মাওলানা মওদূদী সাহেব সম্পর্কে শিক্ষাজগৎ বেশ ভালভাবেই অবগত হয়েছে। আর এটা সত্য যে, তিনি এযুগের একজন ইসলামী দার্শনিক ও উচ্চ মর্যাদশীল আলেমে দ্বীন। ইউরোপ থেকে নাস্তিকতার যে সয়লাব হিন্দুস্তানে এসেছিল, আল্লাহ্ তায়ালা এটাকে থামানোর ব্যবস্থা এমন পবিত্র হাত দ্বারা করেছেন, যিনি ইউরোপের আধুনিক এবং প্রাচীন মতাদর্শ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন এবং এর সাথে কোরআন ও হাদিসের উপর এত গভীর ও স্পষ্ট জ্ঞান রাখেন যে, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মাসআলার উপর তার আলোকে সন্তোষজনক আলোচনা রাখতে পারেন। এ কারণে বড় বড় নাস্তিকরাও তার যুক্তির সামনে নত হয়ে যায়। আর এটা স্পষ্টতঃ বলা যায় যে, মওদূদী সাহেবের সাথে হিন্দুস্তান এবং বিশ্বের মুসলমানের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত।

(মাওঃ আস'আদ গিলানী প্রণীত 'মাওলানা মওদূদী সে মিলিয়ে')

হাফিজুল হাদিস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তীর ছেলে আল্লামা ফেদাউর রহমান দরখাস্তীর অভিমত

হাফিজুল হাদিস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তী ২৭/২/৮৭ ইং তারিখে সিলেট আগমন করলে সিলেটের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সিলেট কণ্ঠ' তাঁর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় দরখাস্তী সাহেবের ছেলে আল্লামা ফেদাউর রহমান দরখাস্তীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারে এক পর্যায়ে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি যে উত্তর দেন তা অবিকল নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

উত্তর ঃ তাদের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ তারা কঠোরভাবে পালন করে। ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলনে তারা নিরলসভাবে কাজ করছে। পাকিস্তানে আমরা তাদের সাথে মিলে ইসলামী আন্দোলন করছি।

(দেখুন সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ, ২৫তম সংখ্যা, ১৮ মার্চ '৮৭)

শেষ কথা

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ। মানুষ মরে যাওয়ার পর একান্ত জালিম না হলে দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সবাই তার মাগফিরাতের দো'আ করে। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরোধীরা এতই পাষাণ যে, তাঁকে দো'আ করা তো দূরের কথা বরং তারা তাঁর সম্পর্কে বলছে– 'মওদূদী আমেরিকার দালাল ছিলেন, তাই আমেরিকায়ই তার মৃত্যু হয়েছে। নতুবা পাকিস্তানে বা অন্য কোন মুসলিম দেশে তাঁর মৃত্যু হত।'

তাদের এ যুক্তি অনুযায়ী কেউ যদি বলে, তাদের যেসব পীর-মাশায়েখ কাফির অথবা মুশরিকদের দেশে মৃত্যু বরণ করেছেন, তারা কাফির এবং মুশরিকদের দালাল ছিলেন (نعوذ بالله) তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। লক্ষ্য করুন, কি মারাত্মক কথা! যে মাওলানা মওদূদীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা; আর এ লক্ষ্যের পিছনে তাঁর সমস্ত জীবন ব্যয় করে গেছেন; এমনকি এ জন্য তিনি ফাঁসিকাষ্ঠের সম্মুখীন হতেও পিছপা হননি; যাঁর ইন্তেকালের পর বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি মুসলীম রাষ্ট্র তাঁর জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, খানায়ে কাবার ইমামসহ প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ যাঁর জানাজায়ে শরীক হয়েছিল, হারামাইন শরীফাইনে যার গায়েবানা জানাজা হয়েছিল, বিভিন্ন মুসলিম দেশ যাঁকে মুজাদ্দিদ হিসেবে শ্রদ্ধা করে, তাকে আজ আমেরিকার দালাল, গোমরাহ এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধাবোধ করছে না। মুসলিম জাতির এরচেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

ইতিহাস সাক্ষী যে, যখনই আল্লাহর কোন বান্দাহ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তখনই তাঁকে গোমরাহ, কাফির ইত্যাদি বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাঁর লিখনী এবং দাওয়াত বুঝতে চেষ্টা করতঃ অন্তরের পর্দা খুলে গেলে তাঁকেই আবার 'মুজাদ্দিদে মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। তাই ইতিহাসে খোঁজ করলে দেখা যায় যে, এ

ধরনের ফতোয়া থেকে রেহাই পাননি চার ইমামের কেউ। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে তো তৎকালীন সরকারের পদলেহী কতিপয় আলেমের প্ররোচনায় সরকারী কোপানলে পড়ে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তো কারাগারেই শাহাদত বরণ করেন। ইমাম গাজ্জালীর বিরুদ্ধবাদীরা তো তাঁকে কুফরীর ফতোয়া, তাঁর অমূল্য গ্রন্থারাজীকে কুফরী উৎপাদনকারী বলে পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিল। এ কুফরী ফতোয়া থেকে রক্ষা পাননি এ যুগের আলেমে দ্বীন মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, মাওলানা কাশেম নানুতুভী, মওলানা আশরাফ আলী থানবীও।

ফতোয়ার এ ধারানুযায়ী মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-ও কুফরী ফতোয়া থেকে রেহাই পাননি। ফতোয়াবাজরা তাঁর লিখিত গ্রন্থরাজী পাঠ করাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছে। কিন্তু তাদের এ ফতোয়া কতটুকু সঠিক তা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন, আমরা তথাকথিত ফতোয়ার জালকে ছিন্ন করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যে ইসলামী আন্দোলন গড়ে রেখে গেছেন সে আন্দোলনে শরীক হই।

আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার পথভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করার যেন তৌফিক দান করেন। আমীন!

পরিশিষ্ট

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর সার্টিফিকেটসমূহ

অপবাদকারীরা অনেক সময় অপবাদ দিয়ে বলে যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেননি এবং তাঁর কোন সার্টিফিকেটও নেই। সুতরাং তার কথার কি-ইবা মূল্য আছে!

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একমাত্র সার্টিফিকেটই যোগ্যতার কোন মাপকাঠি নয়। বরং অনেক সার্টিফিকেটহীন ব্যক্তি সার্টিফিকেটধারীদের চেয়ে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। মাওলানার সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও এত অপবাদের পরও সার্টিফিকেট প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেননি বরং সর্বদা কাজের মাধ্যমে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই অধ্যয়ন রুমে যে সার্টিফিকেটগুলো পাওয়া যায়, নিচে সেগুলোর প্রতিচ্ছবি দেয়া হল।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتأزر بإزار العظمة والعلاء، المرتدي برداء المجد والعزة والكبرياء. اللهم لا نحصي عليك الثناء، انت كما اثنيت على نفسك بلا امتراء، فانت الهم من درك العقول والظنون والاوهام وراء الوراء، ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء، سبحانك ما اعظم شانك، و احكم برهانك، مننت علينا بارسال الرسل، وكرمتنا بانزال الكتب من السماء، وهديتنا الملة الحنفية السمحة السهلة البيضاء، التي ليلها ونهارها سواء، وعلمتنا من العلوم النبوية والحكم المصطفوية ما لم نعلم فعلونا به مدارج السماء.

اللهم فصل وسلم، وزد وتفضل، وبارك وانعم، على سيدنا سيد الرسل وخير خلقك عبدك محمد، داعي الخلق والهادي الى الحق، الماحي سبل الضلال والفسق، تنور العالم بنور هدايته وضياءه، وتزينت السماء والارض بزينته وبهائه وعلى اله واصحابه،

اما بعد فان اخانا في الدين السيد ابا الاعلى المودودي قد قرأ على الحديث والفقه والادب، واني قرأت مبادي الكتب في الخانقاه الامدادية ثم بعد ذلك دخلت في المدرسة المسماة بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهارنفور، وقرأت بقية الكتب في هذه المدرسة وحصلت السند فلما طلب هذا الشيخ مني السند واستجازني على الشروط المعتبرة عند علماء هذه الفنون، اعطيت هذه الصحيفة سندا وهو بحمد الله شاب صالح ذكي بارع اهل للدرس والافادة. فاوصيه بتقوى الله في السر والعلانية وان لا ينساني في دعواته في خلواته وجلواته. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

حرره اشفاق الرحمن عفي عنه كاندهلوي مدرس مدرسة فتحپوري دهلي

তিরমিজী শরীফ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক সমাপ্তির সার্টিফিকেট

امتحانات علوم السنۂ مشرقیہ

تصدیق کیجاتی ہے کہ ابوالاعلیٰ بن سید احمد حسن صاحب طالب علم مدرسہ

امتحانات علوم والسنۂ مشرقیہ دولت آصفیہ خلدہا اللہ تعالیٰ کے

امتحان مولوی میں بمقام بلدۂ فرخندہ بنیاد حیدرآباد دکن بدرجہ دوم

کامیاب ہوا اور اسکا نمبر بلحاظ سلسلۂ کامیابان (٦) ہے

মৌলভী পরীক্ষার সার্টিফিকেট। এতে তিনি ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، والسلام على نبيه المصطفى وآله المجتبى، ما دامت الارض والسموات العلى ـ

اما بعد فان اخانا فى الدين السيد ابا الوفا الموعودى قد قرأ على الجامع للامام الهمام ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى، ثم الموطا للامام الهمام مالك ابن انس الاصبحى برواية يحيى بن يحيى الليثى المصمودى واخذت كلا الكتابين قراءة وسماعا عن الشيخ خليل احمد حين كان مدرسا فى مدرسة سهارنفور، انه قال حدثنى الشيخ محمد مظهر النانوتوى، انه قال حدثنى مولانا مملوك على، انه قال حدثنى الشاه محمد اسحاق الدهلوى قال الشيخ المذكور حصل لى الاجازة والقراءة والسماعة من الشيخ عبد العزيز وحصل له الاجازة والقراءة والسماعة عن الشيخ ولى الله الدهلوى، قال الشيخ ولى الله اخبرنا به الشيخ ابو الطاهر المدنى، عن ابيه الشيخ ابراهيم الكردى عن الشيخ المزاحى، عن الشهاب احمد السبكى، عن الشيخ النجم الغيطى، عن الزين زكريا، عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغى، عن الفخر بن البخارى، عن عمر بن طبرزد البغدادى، قال اخبرنا الشيخ ابو الفتح عبد الملك بن ابى القاسم عبد الله بن ابى سهل الهروى الكروخى، قال نا القاضى الزاهد ابو عامر محمود بن القاسم بن محمد الازدى، قال الكروخى واخبرنا الشيخ ابو نصر عبد العزيز بن محمد بن على بن ابراهيم الترياقى والشيخ ابو بكر احمد ابن عبد الصمد بن ابى الفضل بن ابى حامد الغورجى. قالوا انا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن ابى الجراح الجراحى المروزى، انا الشيخ الثقة ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى

[illegible]

وقال الشيخ ولى الله الدهلوى، اخبرنا الشيخ ... الموطا الشيخ وفد الله المكى المالكى قراءة منى عليه من اوله الى آخره، نحو سماعه بجميعه على الشيخ حسن بن على العجيمى والشيخ عبد الله بن سالم البصرى المكى قالوا اخبرنا الشيخ عيسى المغربى، لقرأته على الشيخ سلطان بن احمد المزاحى، لقرأته على الشيخ احمد بن خليل لقرأته على النجم الغيطى، بسماعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطى، بسماعه على ابى الحسن بن محمد بن ايوب الحسنى النسابة، بسماعه على عمه ابى محمد الحسن بن ايوب النسابة، بسماعه على ابى عبد الله محمد بن جابر الوادياشى عن ابى محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن هارون القرطبى، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجى القرطبى، عن ابى عبد الله محمد بن فرج مولى ابن طلاع، عن ابى الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار، عن ابى عيسى يحيى بن عبد الله قال اخبرنا عم والدى عبيد الله بن يحيى، قال اخبرنا والدى يحيى بن يحيى الليثى المصمودى عن امام دار الهجرة مالك ابن انس الا ابوابا ثلثة من آخر الاعتكاف فمن زياد بن عبد الرحمن عن الامام مالك ابن انس رحمه الله

فلما طلب هذا الشيخ منى السند واستجازنى على الشروط المعتبرة عند علماء هذا الفن اعطيته هذه الصحيفة سندا، وهو بحمد الله شاب صالح ذكى بارع اهل للدرس والافادة فاوصيه بتقوى الله فى السر والعلانية وان لا ينسانى فى دعواته فى خلواته وجلواته وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

حرره

اشفاق الرحمن ...

المدرس ...

হাদিস, ফিকাহ ও আরবী সাহিত্যের সার্টিফিকেট

سُبحان الملك الحى الذى لاينام ولايموت سبوح قدوس ربنا ورب الملئكة والروح. عالم الغيب والشهادة. وهو اللطيف الخبير. والصلوة والسلام على حبيبه الاعظم وخليله الاكرم. سيد ولد آدم. وصفوة الصفوة من جميع العالم محمد المصطفى وعلى آله المجتبى

وبعدُ فان العلوم على تشعب فنونها وتكثر شجونها ارفع المطالب وانفع المآرب، وقد من الله تعالى من عباده على من اعتنى لطلبها واخذها وفاز بحصولها واتقانها. وكان منهم من حوى الفضائل الانسية ورقى المعارج السنية فقرأ جملة الكتب الانتهائية من العلوم العقلية والنقلية والادبيه. بغاية من التحقيق ونهاية من التدقيق. فبرع فيما قرأ علىّ. وهو الفاضل الذكى والمتوقد الالمعى المولوى السيد ابوالاعلى المودودى. وبعد البلوغ مرتبة التكميل. طلب منى اجازة عامة لعلوم العقلية والبلاغة. والادبيه وسائر العلوم الاصلية والفرعيه. فاسعفته بمطلوبه ومرغوبه وارجو منه ان لاينسانى من صالح دعواته فى جميع اوقاته واوصيه و اياى بتقوى الله فى السر والعلن. ومتابعة الكتاب والسنن. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

حرره المجيز الحقير الراجى الى الله محمد شريف الله عفى عنه الله المدرس فى مدرسة دارالعلوم فتحپورى دهلى. فقط

٢٢ جمادى الثانى سنة ١٣٤٤ھ

ফিলসফি, বালাগাত, আরবী সাহিত্যে এবং

সমস্ত মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা জাতীয় ইলমের সার্টিফিকেট

যাঁরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করেছেন তাঁদের নাম নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো

১. আল্লামা শফিকুল সাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, গাছবাড়ী জে. ইউ, কামিল মাদ্রাসা, সিলেট।
২. আল্লামা ইদ্রিস আহমদ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, গাছবাড়ী জে, ইউ, কামিল মাদ্রাসা, সিলেট।
৩. আল্লামা আবদুর রব কাসিমী, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, কানাইঘাট মনসুরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
৪. আল্লামা ইলিয়াস সাহেব, প্রাক্তন শায়খুল হাদিস ও তাফসির, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. মাওলানা আবু তাহির, চট্টগ্রাম।
৬. মাওলানা আবদুস্ সোবহান, পাবনা।
৭. শায়খুল হাদিস মাওলানা ইউসুফ সাহেব, খুলনা।
৮. মাওলানা আবদুস্ সাত্তার, খুলনা।
৯. মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী, ঢাকা।
১০. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ঢাকা।
১১. মাওলানা আবু তাহের মোহাম্মদ মাসুম, ঢাকা।
১২. মাওলানা আহমদুল্লাহ, মসজিদ মিশন, ঢাকা।
১৩. মাওলানা মীম ফজলুর রাহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ।
১৪. মাওলানা কামালুদ্দিন জাফরী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী
১৫. হাফেজ মাওলানা লুৎফর রহমান, বার্মিংহাম, লন্ডন।
১৬. মাওলানা একরামুল হক, লন্ডন।
১৭. মাওলানা আমীন খান, সদস্য, ইসলামী এনসাইক্লোপেডিয়া সংকলন ব্যুরো, ওয়াকফ মিনিস্ট্রি, কুয়েত।
১৮. মাওলানা নূরুল ইসলাম, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য।
১৯. মাওলানা আবদুল মান্নান, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য।
২০. হাফেজ মাওলানা তফাজ্জুল হক, আজমান, মধ্যপ্রাচ্য।
২১. মাওলানা আবদুল খালিক, জিদ্দাহ, সৌদি আরব।
২২. মাওলানা ইসহাক আহমদ আল-মাদানী, প্রতিনিধি, দারুল ইফতা, সৌদি আরব।
২৩. মাওলানা হাবিবুর রহমান, পীর সাহেব, দৌলতপুর, সিলেট।
২৪. মাওলানা আবদুস সালাম, প্রাক্তন মুহাদ্দিস-সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
২৫. মাওলানা আবদুল মালিক, মুহাদ্দিস, সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
২৬. মাওলানা মাহমুদ হোসেন, মুহাদ্দিস, সরকারী আলীয় মাদ্রাসা, সিলেট।
২৭. মাওলানা এখলাছুল মুমিন জায়ফরপুরী, সিলেট।
২৮. মাওলানা আবদুস সামাদ, প্রিন্সিপাল, কেরামত নগর সিনিয়র মাদ্রাসা, সিলেট।
২৯. মাওলানা ইলিয়াস, প্রিন্সিপাল, মনসুরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
৩০. মাওলানা নূরুদ্দিন হোসাইন, ভাইস প্রিন্সিপাল, মনসুরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
৩১. মাওলানা হোসাইন আহমদ, শিক্ষক, মনসুরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।

৩২. মাওলানা হাবিবুর রহমান, প্রিন্সিপাল, আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া, ইস্‌লামপুর, সিলেট।

৩৩. মাওলানা আবু তাইয়িব, সুপার, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, পাঠানটুলা, সিলেট।

৩৪. মাওলানা আতিকুর রাহমান, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, পাঠানটুলা, সিলেট।

৩৫. মাওলানা জুবায়ের আহমদ, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, পাঠানটুলা, সিলেট।

৩৬. মাওলানা ওসমান গনী, প্রিন্সিপাল, দারুল ইসলাম মাদ্রাসা, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৩৭. মাওলানা আবদুস্ সুবহান, সুপার, মোঘলগাঁও মাদ্রাসা, সিলেট।

৩৮. মাওলানা আবদুর রাহমান, প্রাক্তন সুপার, দারুস্‌সুন্নাহ মোহাম্মদীয়া মাদ্রাসা, বড়লেখা, সিলেট।

৩৯. মাওলানা আলতাফুর রাহমান, সুপার, সুন্দিসাইল মাদ্রাসা, সিলেট।

৪০. মাওলানা ইবাদুর রাহমান, শিক্ষক, রহিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, সিলেট।

৪১. মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৪২. মাওলানা ক্বারী জমীর উদ্দিন, সভাপতি, জালালাবাদ ইমাম সমিতি, সিলেট।

৪৩. মাওলানা আবদুল মতিন, সেক্রেটারী, জালালাবাদ ইমাম সমিতি, সিলেট।

৪৪. মাওলানা আবদুল হালিম, জয়েন্ট সেক্রেটারী, জালালাবাদ ইমাম সমিতি, সিলেট।

৪৫. মাওলানা তাহির আলী, প্রচার সম্পাদক, জালালাবাদ ইমাম সমিতি, সিলেট।

৪৬. মাওলানা আব্দুল আজিজ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৪৭. মাওলানা আবদুর রকিব, প্রাক্তন ইমাম, কুদরতুল্লাহ জামে মসজিদ, সিলেট।

৪৮. মাওলানা আবদুল মতিন, খতিব, রিকাবী বাজার মসজিদ, সিলেট।

৪৯. মাওলানা লুৎফুর রাহমান, ইমাম, পশ্চিম কাজির বাজার মসজিদ, সিলেট।

৫০. মাওলানা আব্দুর রাহিম, শায়খে চরিপাড়ী, সিলেট।

৫১. মাওলানা আনোয়ার উদ্দিন, খতিব, কুয়ারপার জামে মসজিদ, সিলেট।

৫২. মাওলানা জিয়াউল ইসলাম, ইমাম, তাঁতিপাড়া জামে মসজিদ, সিলেট।

৫৩. মাওলানা আবদুল মুসাব্বির, ইমাম, পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, সিলেট।

৫৪. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ, ইমাম, বাবুস্ সালাম জামে মসজিদ, সিলেট।

৫৫. মাওলানা আবদুল খালিক, ইমাম, পশ্চিমবাগ জামে মসজিদ, সিলেট।

৫৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব, ইমাম, সানাউল্লাহ জামে মসজিদ, সিলেট।

৫৭. মাওলানা শহিদুর রাহমান, ইমাম, উপজেলা মসজিদ, কানাইঘাট, সিলেট।

৫৮. মাওলানা মন্‌তাজির আলী, শিক্ষক, চৌধুরী বাজার মাদ্রাসা, সিলেট।

৫৯. মাওলানা হেলাল আহমদ, শিক্ষক, বরইকান্দি মাদ্রাসা, সিলেট।

৬০. মাওলানা মনজুর আহমদ, প্রাক্তন শিক্ষক, বিশ্বনাথ আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট।

৬১. মাওলানা শামসুদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক, দরগাহে শাহজালাল মাদ্রাসা, সিলেট।

৬২. অধ্যাপক মাওলানা ফরমান আলী, এম; এম,এম,এ, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৬৩. অধ্যাপক মাওলানা ওলিউর রাহমান এম,এম; এম,এ, কানাইঘাট, সিলেট।

৬৪. অধ্যাপক মাওলানা জামালউদ্দিন, এম,এম; বি,এ (অনার্স); এম, এ, সিলেট।

৬৫. অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রাহমান, এম,এম; বি,কম, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া, সিলেট।

৬৬. জনাব এ, এইচ, এম ইসরাইল আহমদ, এম,এম; বি,এড, জগন্নাথপুর।

৬৭. জনাব আমিরুল ইসলাম এম,এম, বি; এ।

৬৮. মাওলানা রেজাউল করিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৬৯. মাওলানা আবদুন নূর, মুহাদ্দিস, ফকীহ, নবীগঞ্জ।

৭০. মাওলানা জাহাঙ্গীর কবীর, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৭১. মাওলানা মশহুদ আহমদ, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৭২. মাওলানা শামসুল ইসলাম, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৭৩. মাওলানা আবদুল জলিল, শিক্ষক, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৭৪. মাওলানা নূরুল ইসলাম, বিশ্বনাথ, সিলেট।

৭৫. মাওলানা আবদুল্লাহ আনসার, বিয়ানী বাজার, সিলেট।

৭৬. মাওলানা আবদুল কাহার, নবীগঞ্জ, সিলেট।

৭৭. মাওলানা আবদুল খালিক, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৭৯. মাওলানা জালাল উদ্দিন, গংগাজল, সিলেট।

৮০. মাওলানা জমির আহমদ, শহিদাবাদ, সিলেট

৮১. মাওলানা শাব্বির আহমদ খান, বড়লেখা, সিলেট।

৮২. হাফেজ মাওলানা আবুল হোসেন খান, কানাইঘাট, সিলেট।

৮৩. মাওলানা জিল্লুর রাহমান, কানাইঘাট, সিলেট।

৮৪. মাওলানা মাহমুদুর রাহমান (মাহমুদ), পীরমহল্লা সিলেট।

৮৫. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আনসারী, গোলগাঁও হবিগঞ্জ।

৮৬. মাওলানা রেজাউল করিম নূর, মোহাম্মদপুর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

৮৭. মাওলানা আবদুল হাই, মোহাম্মদপুর চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

৮৮. মাওলানা আলাউদ্দিন, সুনামগঞ্জ।

৮৯. মাওলানা আ, ফ, ম, শফিকুল ইসলাম, গবিন্দগঞ্জ।

৯০. মাওলানা খলিলুর রাহমান, গংগাজল, সিলেট।

৯১. মাওলানা হেলাল আহমদ, শ্রীমঙ্গল, সিলেট।

৯২. মাওলানা আবদুর রাহমান, বারহাল, সিলেট।

৯৩. মাওলানা মুকাররম আলী, শ্রীধরা, সিলেট।

৯৪. মাওলানা আহমদ শামীম, ঝিংগাবাড়ী, সিলেট।

৯৫. মাওলানা ফয়জুর রাহমান, গাছবাড়ী, সিলেট।

৯৬. হাফেজ মাওলানা জহিরুল ইসলাম, ঝিংগাবাড়ী, সিলেট।

৯৭. হাফেজ মাওলানা আবদুল মুকিত আজাদ, শরীফগঞ্জ, সিলেট।

৯৮. মাওলানা মুস্তাক আহমদ হেলালী, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৯৯. মাওলানা আবদুস্ সবুর, কানাইঘাট, সিলেট।

১০০. মাওলানা মোহাম্মদ সাহেব, বাঁশবাড়ী সিলেট।

আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ০১৭১-১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯